বিংশ অধ্যায়

উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহ

অমরকুন্ড ঃ লালবাগ মহকুমার নবগ্রাম থানার একটি গ্রাম। ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে বহরমপুর থেকে ১২ কিমি উত্তর-পশ্চিমে শিবপুর হয়ে রাইন্ডা বা গোপগ্রাম এর ভিতর দিয়ে ৩/৪ কিমি গেলে এই গ্রামে পৌঁছানো যায়। ভিতরের রাস্তা প্রায় সবই ইঁট বাঁধানো পাকা। অতি প্রাচীন এই জনপদই আজকের অমরকুন্ড বা অমৃতকুন্ড, যেখানে অতীতে বহু ব্রাহ্মণের বসবাস ছিল। ছিল বহু দেবালয়। গ্রামের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ধ্বংসাবশেষ অতীত দেবালয় ও ভদ্রাসনের সা(্য বহন করে। দুটি চারচালা শিব মন্দির আজও আছে। আছে দুটি তান্ত্রিক সাধন পীঠ— যা পঞ্চমুন্ডির আসন সংযুক্ত(। প্রাচীন পুরাকীর্তির পরিচায়ক সূর্যমন্দিরটি বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত। একাদশ শতাব্দীর দুটি বিষু(মূর্তি যে দেবালয়গুলিতে পূজিত হ'ত সেগুলির নক্সা করা চৌকাঠ ও কা(খচিত পাথরের থাম আজও গ্রামে দেখা যায়। প্রাচীন বুদ্ধমূর্তিটি রঘুনাথ রূপে পূজিত হয়। বাংলার নবাবী আমলে নবাব আলীবর্দীর দেওয়ান চায়েন রায় এই গ্রামে বসবাস করে গ্রামটির অনেক উন্নতি সাধন করেন। আজও গ্রামটিতে অনেক সমৃদ্ধ ব্যক্তি(র বসবাস। স্থানটি ভক্ত(পূণ্যার্থী, প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ইতিহাস পিপাসু দর্শনার্থীর নিকট আজও আকর্ষণীয়।

আজিমগঞ্জ ঃ ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে পূর্ব রেলপথের ব্যান্ডেল বারহাড়োয়া রেলপথে একটি জংশন স্টেশন আজিমগঞ্জ। আজিমগঞ্জ ও ভাগীরথীর পূর্ব তীরে জিয়াগঞ্জ শহর নিয়ে গড়ে উঠেছে আজিমগঞ্জ-জিয়াগঞ্জ পৌরসভা। বহরমপুরের ২০ কিমি উত্তরে। একসময় মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম-উস্-সান ছিলেন বাংলার সুবাদার। তাঁর নামানুসারে এই শহরের নাম আজিমগঞ্জ। আজিমগঞ্জে প্রধানত জৈনদের বাস। তাঁদের পূর্বপু(ষেরা আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রাজস্থানের বিকানীর থেকে এখানে আসেন। তাঁদের চেষ্টায় আজিমগঞ্জ আঠার-ঊনিশ শতকে বাংলার একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে জগৎশেঠের আমন্ত্রণে আগ্রাবাসী খড়্গ সিং এখানে এসে বসতি স্থাপন করেন। ১৭৭৪ সালে আসেন হাজারীমল। এঁরা আজিমগঞ্জের প্রথম দিকের বাসিন্দা। ধনী জৈন মহাজনদের বিশাল অট্টালিকা, নাহার পরিবারের বাসগৃহ এবং কয়েকটি অতি সুন্দর জৈন মন্দির এ শহরের দর্শনীয় বস্তু। বহু চূড়াযুক্ত(সুউচ্চ দুটি মন্দির উল্লেখযোগ্য। এই (ুদ্র শহরে ব্রিটিশ আমলে যত রায় বাহাদুর হন তত আর কোথাও হননি। এঁদেরই একজন রায় ধনপৎ সিং বাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। রায় বুধ সিং বাহাদুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। মুর্শিদাবাদের সর্বপ্রথম রেলপথ আজিমগঞ্জ-নলহাটি রেলপথটি তৈরীর জন্য ধনপৎ সিং রেল কোম্পানীকে প্রস্তাব দেন এবং তিনি নিজে এর অনেকটা ব্যয়ভার গ্রহণ করেন।

কালিকাপুর ঃ বর্তমানে কাশিমবাজার রেলস্টেশন সংলগ্ন কালিকাপুর একসময় ওলন্দাজদের সমৃদ্ধ বাণিজ্যকুঠি ছিল। বাংলায় বাণিজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে আসা ইউরোপীয়দের মধ্যে ইংরেজদের আগে এবং পর্তুগীজদের পরে এসেছে ওলন্দাজেরা। অর্মে-র মতে - ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দের কিছুকাল আগে থেকেই তারা বাংলার চুঁচুড়া, বরাহনগর, ঢাকা, পাটনা এবং কালিকাপুর অঞ্চলে স্থায়ী বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে তোলে এবং বসবাস করতে থাকে। সন্দেহ নেই মুর্শিদাবাদ তথা কালিকাপুরে সর্বপ্রথম ওলন্দাজদের কুঠীই গড়ে ওঠে। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে উড়িষ্যার হরিহরপুর ও বালে(রে প্রতিষ্ঠিত ইউরোপীয়দের কুঠীর চেয়েও প্রাচীন ছিল কাশিমবাজারের কালিকাপুরের কুঠীগুলি। রেভারেন্ড লং সাহেব ও মিস্টার ব্রুটনের বর্ণনায় ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে কাশিমবাজারে ইউরোপীয়দের কুঠীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্রুটন ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে মছলিপত্তন থেকে প্রথমে উড়িষ্যা ও পরে বাংলায় উপস্থিত হন। সে সময় ঐ দুই জায়গায় ইংরেজদের কোনো কুঠী ছিলনা। সুতরাং ১৬৩২ সালে কাশিমবাজারের কুঠী আসলে ওলন্দাজদেরই কুঠী।

সাড়ে তিনশো বছরেরও বেশী প্রাচীন কালিকাপুরের এই বাণিজ্যকুঠী প্রধানত রেশম, মসলিন, কার্পাস তুলা ও হাতির দাঁতের ব্যবসার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ এই ওলন্দাজ কুঠীর থেকে উৎকৃষ্ট মানের রেশম ভারতের আমেদাবাদ, সুরাট প্রভৃতি কেন্দ্রে এবং ভারতের বাইরে ব্রিটেন, জাপান, হল্যান্ড প্রভৃতি অঞ্চলে রপ্তানী হ'ত। কাশিমবাজারের এই রেশম উৎপাদনের পরিমাণ ছিল বার্ষিক প্রায় ২২,০০০ গাঁট সুতো, যার অধিকাংশই জাপান ও হল্যান্ডে পৌঁছাত এবং ভারতে মোগল ও তাতার ব্যবসায়ীরা কিনে নিতেন

(স্যার যদুনাথ সরকার - ওল্ড মুর্শিদাবাদ ঃ হিস্টোরিক্যাল মেমোরিজ - কৃষ(নাথ কলেজ সেন্টেনারী কমেমোরেশন ভলিউম)। ওলন্দাজদের প্রধান ভারতীয় বাণিজ্যকেন্দ্র চুঁচুড়ার অধীনস্থ ছিল কালিকাপুরের এই বাণিজ্যকেন্দ্রটি। নবাবী আমলে, বিশেষত, আলীবর্দী, সিরাজ-উদ্-দৌল্লা ও মীরজাফরের সময় কালিকাপুরে ওলন্দাজরা প্রাধান্য বিস্তার করে।

সিরাজ-উদ্-দৌল্লার সময় মিস্টার ভিনেট কালিকাপুরের কুঠীর অধ্য(ছিলেন। কাশিমবাজার থেকে ইংরেজদের বন্দী অবস্থায় সিরাজের কাছে আনা হলে মিস্টার ভিনেট প্রতিনিধি হয়ে তাদের মুক্তি(র ব্যবস্থা করেন। ১৭৫৯ সালে চুঁচুড়ার ওলন্দাজরা ক্লাইভের আদেশে আত্র(ান্ত ও পরাস্ত হলে তারা চুঁচুড়া, কাশিমবাজার বা কালিকাপুর ও পাটনার কুঠী র(া করার জন্য ১২৫ জন ইউরোপীয় সৈন্য রাখার অনুমতি পেয়েছিলেন (বিভারিজ -হিস্ট্রি অব্ ইন্ডিয়া- ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৬৩)। এরপর থেকেই ওলন্দাজদের (মতা কমে যায়। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ জুলাই গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের আদেশে কর্ণেল আয়রণসাইড কালিকাপুরের কুঠী দখল করেন। সে সময় কালিকাপুরে একটি দুর্গও ছিল (স্ট্যাটিস্টিক্যাল রিপোর্ট অব্ মুর্শিদাবাদ - গ্যাস্ট্রেল। পরে ইংরেজরা কালিকাপুরের কুঠী ও সংলগ্ন বাণিজ্যকেন্দ্র ওলন্দাজদের কাছ থেকে কিনে নেয়। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে ঐ কুঠীর উপকরণ দিয়ে বহরমপুর থেকে লালবাগ পর্যন্ত নদীতীরের রাজপথ নির্মিত হয়।

বর্তমানে কালিকাপুরে প্রাচীন কুঠী বা বাণিজ্যকেন্দ্রের সামান্য ধ্বংসাবশেষও নাই। দ্রষ্টব্য বলতে রয়েছে কেবল একটি সমাধি স্থান। উল্লেখ্য যে ওলন্দাজদের এই সমাধিস্থানটিই মুর্শিদাবাদে ইউরোপীয়দের সবচেয়ে প্রাচীন সমাধিভূমি। সমাধি(ত্রের পশ্চিমে রাস্তার বাঁদিকে একটা সময় পর্যন্ত রোমান ক্যাথলিক গির্জা ও মঠ অবস্থিত ছিল। এখন তার চিহ্(মাত্র নাই।

যে সময় ভাগীরথী কালিকাপুরের নিচ দিয়ে প্রবাহিত হ'ত, তখন কার্ত্তিক বিসর্জনের দিন একটি বিরাট উৎসব হ'ত। উৎসব উপল(্যে একটি মেলা বসত এবং নদীতে ময়ূরপঙ্খী ও ছিপ নৌকার বাইচ হ'ত। নানা মানুষের সমাগমে উৎসবের আঙিনা হ'ত মুখরিত। মুর্শিদাবাদের অভিজাত, গণ্যমান্য লোকেরা এমনকি নবাব বংশের সদস্যরাও আসতেন। পরে কাশিমবাজার সংলগ্ন ভাগীরথীর প্রবাহ (দ্ধ হওয়ায় এবং আকস্মিক মড়কের প্রাদুর্ভাবে কাশিমবাজারের মতো কালিকাপুরও জনশূণ্য হয়ে যায়। কিছুকাল আগে পর্যন্ত এখানে একটি পুলিশ ফাঁড়ি ছাড়া মানুষের বসবাস প্রায় ছিল না। অতি সম্প্রতি সমাধিস্থানের বিপরীত দিকে নতুন করে মানুষের বসবাস শু(হয়েছে।

কালিকাপুরে ওলন্দাজদের যে প্রাচীন সমাধি(ত্রটি এখনো রয়েছে, একসময় সেখানে প্রায় ৪৭টি সমাধি স্তম্ভ ছিল (গ্যাসট্রেলের মতে)। বর্তমানে রয়েছে ২১ টি। এর মধ্যে ৬টির উপরে কেবল সুদৃশ্য স্তম্ভ রয়েছে। অন্যগুলি মাটি থেকে দু'তিন ফুট উঁচু হয়ে রয়েছে। বাকী স্তম্ভগুলির চিহ্(মাত্র নাই। এগুলির মধ্যে ড্যানিয়েল ভ্যানডার মিউলের সমাধিটিই সবচেয়ে প্রাচীন। ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মে তিনি সমাহিত হন। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ২০ শে অক্টোবর সমাহিত জন কান্ট ভূর্টের সমাধিটি সর্বশেষ সমাধি। যে কটি সমাধি স্তম্ভ এখন বর্তমান তার মধ্যে টেমারস ক্যান্টর ভিশার-এর সমাধি স্তম্ভটিই সর্বোচ্চ। ভিশার ১৭৭৮ সালে মারা যান।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী পূর্ত বিভাগের অন্তর্ভূক্ত(৮ নম্বর বাড়ির এই সমাধি স্থানের ১ নং সমাধিটি গ্রেগোরিয়াস হারক্লোতসের (১৭৮৭ খ্রীঃ প্রয়াত), ১২ নং সমাধিটি ম্যাথিউ আরনল্ড ব্রেহে (১৭৭২ খ্রীঃ প্রয়াত) এবং জোহানা বি ভান্স ব্রেহের। ২২ নং সমাধিটি জোহান পাউভার ভ্যান অ্যাস্টনের, ১৮ নং সমাধিটি ড্যানিয়ের ভেন্ডার ম্যানজেরির (১৭২১ খ্রীঃ প্রয়াত)।

বর্তমানে সমাধি স্থানটির চারিদিক প্রাচীর বেষ্টিত। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রাচীরটি নির্মিত হয় এবং খরচ হয় ১০০ টাকা। দ(ণ দিকের প্রাচীরের মাঝখানের প্রবেশদ্বার। সেখান থেকে একটি বাঁধানো রাস্তা ভেতর পর্যন্ত গিয়েছে। কালিকাপুর বর্তমানে এক হতশ্রী চেহারায় কেবল মূল্যবান স্মৃতির অবশেষকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে রয়েছে। অতি সম্প্রতি সমাধিস্থলটির সংস্কার করে তার পূর্বরূপ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হচ্ছে।

কালীতলা দিয়ার ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর মহকুমার (সদর) অন্তর্গত কালীতলা দিয়ার গ্রামটি ভাগীরথী নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত।

বহরমপুর শহরের দ(ণে অবস্থিত এই গ্রামটির পূর্বে মানকড়া ও ভাস্কর দহ বিল, পশ্চিমে ভাগীরথী নদী, উত্তরে নারায়ণপুর গ্রাম ও বৈরগাছি গ্রাম এবং দ(ণে কাশীডাঙ্গা ও কদমতলা গ্রাম। গ্রামটি প্রায় দুই শতাধিক বছরের প্রাচীন।

পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহের মুক্ত(াগাছা রাজ পরিবারের জমিদারী অংশ এই কালীতলা দিয়ার গ্রাম। পরবর্তী কালে দেশভাগের পর উক্ত(রাজ পরিবারের জীবেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রামে বসবাসের উদ্দেশ্যে আসন এবং 'মুক্ত(াগাছা ভবন' নির্মাণ করেন। স্থানীয় মানুষেরা এই ভবনটিকে 'রাজবাড়ী' আখ্যা দেন। মূলত জীবেন্দ্রকিশোরের গ্রামে আগমন ও বসবাসের পর থেকেই এই গ্রামের সার্বিক উন্নতির সূচনা হয় । তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে ও দানে এই গ্রামটি নূতন জীবন লাভ করে । বিদ্যালয় স্থাপন , খালখনন, রাস্তা নির্মাণ,

বিদ্যুতায়ন, সমবায় সমিতি গঠন, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ডাকঘর প্রতিষ্ঠা সকল বিষয়েই জীবেন্দ্রকিশোরের দানের কথা ও উদ্যমের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। স্থানীয় গ্রাম বাসীদের চোখে রাজা জীবেন্দ্রকিশোর এক উজ্জ্বল ব্যক্তি(ত্ব ও গ্রামের প্রাণপু(ষ। গ্রামের মূল অধিবাসী প্রধানত চাঁই ও উগ্র(ত্রিয় সম্প্রদায়ভুক্ত(। গ্রামে একটি নিম্ন বুনিয়াদী ও একটি উচ্চ বিদ্যালয় আছে।

১৯৬০ সালে জীবেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরীর জমি ও অর্থ দানে নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। ১৯৬৭ সালে তাঁরই দানে ও উদ্যোগে রাজা জগৎকিশোর উচ্চ বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠা হয় । বিদ্যালয় ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে জাতীয় অধ্যাপক ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু, তদানীন্তন কৃষ(নাথ কলেদের অধ্য(ও বিশিষ্ট শি(াবিদ ডঃ রাম চন্দ্র পাল ও ডঃ রেজাউল করীম উপস্থিত ছিলেন।

গ্রামে একটি '(দ্রা(' বৃ(আছে । তা ছাড়া জীবেন্দ্রকিশোরের নিজস্ব উদ্যোগে লাগান তাঁর নিজস্ব বাগানে গোলমরিচ, তেজপাতা, খয়ের , বড় এলাচ , ছোট এলাচ , রবার , হিং, চন্দন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গাছ রয়েছে।

কাশিমবাজার ঃ মুর্শিদাবাদের জেলা-শহর বহরমপুরের উত্তর-পূর্বদিকে অবস্থিত কাশিমবাজার একটি প্রাচীন বিখ্যাত জনপদ। আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ১৬৩০-১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে এর উত্থান। সে সময় বাংলার পরাত্র(মশালী সুবাদার পর্তুগীজ দমনকারী কাশিম খাঁর নামানুসারে এর নামকরণ করা হয় বলে কোন কোন বিশেষজ্ঞের ধারণা। অন্যমতে (১৯৫১ র সেন্সাস হ্যান্ডবুক অনুসারে) মুসলমান ফকির সৈয়দ কাশিমের নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়েছে বলে মনে করা হয়। আবার সৈয়দ খাজা কাশিম ফকির দরবেশী আলা খাঁর দরগা বা মাজার হাতাবাগানে ইংরেজদের কবরখানার নিকটে অবস্থিত(তাঁর নামেও নামকরণ হয়ে থাকতে পারে।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাশিমবাজার তার সংলগ্ন সৈদাবাদ, কালিকাপুর (কালিকাপুর), শ্রীপুর, ভাটপাড়া, চুনাখালি, ফরাসডাঙ্গা, কদমখন্ডি, বিষু(পুর, দয়ানগর, কুঞ্জঘাটা, বিপ্রঘাটা বা বামুনঘাটা প্রভৃতি জনপদ নিয়ে 'বৃহত্তর কাশিমবাজার' রূপে বর্তমান ছিল। তবে প্রতিটি অঞ্চলই তখন সম্ভবত নিজের স্বতন্ত্র নামেই অভিহিত হ'ত এবং স্ব স্ব নামেই গু(ত্ব পেত। কেননা এগুলির মধ্যে কোন কোন অঞ্চল (যেমন চুনাখালি) ছিল কাশিমবাজারের চেয়েও প্রাচীন। তখন এইসব অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত ভাগীরথী 'কাশিমবাজার নদী' নামে কথিত হ'ত। এই অংশে ভাগীরথীর নাব্যতা ও গভীরতা ছিল বরাবরই কম এবং তা ছিল সংকীর্ণ। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে তা আরও সঙ্কীর্ণ হয়ে ওঠে। ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বিখ্যাত পর্যটক বার্ণিয়ার ও ট্যাভারনিয়ার সুতিতে পৌঁছান। জলপথে অসুবিধা হওয়ার জন্য বার্ণিয়ার স্থলপথে কাশিমবাজারে পৌঁছান। ট্যাভারনিয়ার 'কাশিমবাজার নদী' নামক ভাগীরথীর এই বিশেষ অংশকে (দ্র খাল নামে অভিহিত করেন। হেজেস ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে নদীয়া থেকে মহুলায় পৌঁছিয়ে জলপথে আসতে না পেরে স্থলপথেই কাশিমবাজারে আসেন। হলওয়েল কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ আসার সময় জলাভাবে বজরা ছেড়ে একখানি ছোট ডিঙি নৌকার সাহায্যে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যেতে বাধ্য হন। এইসব ঘটনাই প্রমাণ করে 'কাশিমবাজার নদী' অর্থাৎ ভাগীরথী কত অগভীর ছিল।

তৎকালীন 'মুকসুদাবাদে'র খোশবাগ থেকে ভাগীরথীর পূর্ব-দ(িণ প্রবাহের অংশবিশেষ পরে দ(িণ, দ(িণ-পশ্চিম এবং শেষে উত্তর-পশ্চিম উপকূল অংশে কাশিমবাজার পর্যন্ত বিস্তৃত এই দস্যুভয়যুক্ত(অ(ু(রাকৃতি অংশটি বাণিজ্যসমৃদ্ধ বন্দর রূপে কাশিমবাজারকে গড়ে তোলে। পরে 'কাশিমবাজার নদী' বা ভাগীরথী, পদ্মা ও জলঙ্গী এই তিন নদীর মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ ত্রিকোণ ভূ-ভাগ 'কাশিমবাজার দ্বীপ' নামে অভিহিত হয়। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের রেণেলের মানচিত্রে এর উল্লেখ আছে। সে সময় রেনেল লেখেন যে অক্টোবর থেকে মে মাস পর্যন্ত 'কাশিমবাজার নদী' প্রতি বছরই শুষ্ক থাকত। ক্যাপ্টেন কোলব্রুক ১৭৯৭ সালে এক স্মৃতিচারণায় লেখেন যে জলঙ্গী ও ভাগীরথী সারা বছর নাব্য থাকত না। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দেও এই দুই নদী বিপরীতভাবে বছরে কখনো শুষ্ক, কখনো নাব্য থাকত। ১৭৯৭ সালেও এই নদীপথ নৌকো চলাচলের উপযুক্ত(ছিল না। তাই সে সময় কলকাতা যাতায়াতের জন্য 'কাশিমবাজার নদী' র উপর বিশেষ ভরসা রাখা হ'ত না।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ভাগীরথী তার পুরনো গতিপথ হঠাৎ পরিবর্তন করে। ফলে পুরোনো খাতটি বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হয় এবং মূল স্রোতটি পুরোনো গতিপথ থেকে প্রায় তিন মাইল দূর দিয়ে প্রবাহিত হয়। তখন ভাগীরথীর 'অ(ু(রাকৃতি' বা চুলের কাঁটার মতো বাঁকা অংশটিকে অর্থাৎ কারবালা ও ফরাসডাঙ্গার মধ্যে নদীর প্রবাহকে সোজাসুজি প্রবাহিত করবার জন্য এবং ভাগীরথীকে নাব্য ও স্রোতস্বিনী করে তুলবার জন্য দুই মুখকে কেটে যুক্ত(করা হয়। ফলে মুর্শিদাবাদ ভাগীরথীর প্রাচীন ঐ সুদৃশ্য প্রবাহটি (দ্ধ ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফরাসডাঙ্গা থেকে কাশিমবাজারের উপর দিয়ে প্রায় মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত অংশটিই তখন থেকে 'কাটিগঙ্গা' নামে অভিহিত হতে থাকে। হ্যামিলটনের 'ইস্ট ইন্ডিয়া গেজেটিয়ারে' (১৮১৫) কাটিগঙ্গার এই

দ্বিধাবিভক্ত(করণের উল্লেখ আছে। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের 'ক্যালকাটা রিভিউ'তে জনৈক লেখকের রচনাতেও এর বিবরণ পাওয়া যায়।

অতীতের কাশিমবাজার জন্মলগ্ন থেকেই নাগরিক প্রতিপত্তিতে ছিল সমৃদ্ধ। মূল কাশিমবাজার শহরটি ছিল দৈর্ঘ্যে প্রায় তিন মাইল এবং চারিদিকের আয়তন প্রায় পাঁচ ছয় মাইল বিস্তৃত। অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ এই শহরের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় এক ল(। বহুতল বাড়িগুলি এতই উঁচু ও ঘনসন্নিবিষ্ট ছিল যে রাজপথে নাকি সূর্যালোক প্রবেশ করত না।

১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই কাশিমবাজার রেশম, সুতি, মসলিন প্রভৃতি বস্ত্রের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হয়ে ওঠে। ত্র(মে হাতির দাঁত, শোলা, কাঁসা, কাম্রোরি (কাঠের রেলিঙ বা জালি তৈরী) কাজ, রূপো এমনকী কাগজ তৈরীরও বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। পলাশীর যুদ্ধের পর এই বাণিজ্যের আরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। প্রাথমিকভাবে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্যবসা বাণিজ্যের সুসময় বর্তমান ছিল। উপরে উল্লিখিত পণ্যগুলির ব্যবসা ছাড়াও সে সময় কামানের গোলা তৈরীর কাঁচামাল রূপে পাটনা থেকে আসা প্রচুর পরিমাণে সোরা কাশিমবাজার বন্দর মারফৎ মীর্জাপুর, বারাণসী, পুণা, সুরাট প্রভৃতি অঞ্চলের এবং ভারতের বাইরে ইউরোপে ও চীনে রপ্তানী করা হ'ত। ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে পাটনা থেকে আসা প্রায় ৫০০০ পাউন্ড সোরা এবং ৪০০০ পাউন্ড রেশম কাশিমবাজার থেকে রপ্তানী হয়। ১৬৬০-১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে নিকোলো মানুচী কাশিমবাজারে আসেন। হুগলী থেকে আগ্রায় যাত্রাপথে তৃতীয় দিনে তিনি এখানে পৌঁছান। সে সময় কাশিমবাজারে সুতির তৈরী থান ও কাটা পোষাকের বিপুল সম্ভার তাকে মুগ্ধ করে। তিনি ফরাসী, ওলন্দাজ ও ইংরেজদের মোট তিনটি কুঠীর অবস্থানের কথা জানান।

১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে নাগাদ সোরা ও রেশমের জন্য ১৪ ল(পাউন্ড কেবল কাশিমবাজারেই বিনিয়োগের আদেশ দেওয়া হয়। ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ট্যাভারনিয়ার কুড়ি হাজার পেটি রেশম ইউরোপে রপ্তানী করতে দেখেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সারা ভারতে যে মূলধন বিনিয়োগ করত, শুধু কাশিমবাজারেই বিনিয়োগ করত তার অর্ধেক। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নিয়মিত পঞ্চাশ ষাটটি জাহাজ কাশিমবাজার বন্দর থেকে রেশমের সম্ভার নিয়ে যাতায়াত করত। সে সময় ইংরেজ কোম্পানী থেকে রেশম বস্ত্র উৎপাদনের জন্য স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অগ্রিম রূপে দেওয়া হ'ত ৭ ল(৯১ হাজার ৭৫০ সিক্কা টাকা। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত রেশমের কারবার টিকে ছিল। পরে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।

কেবল রেশমশিল্পের জন্যই নয়, ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানী ২,৯০,০২২ টাকা সুতি বা তাঁত বস্ত্রের জন্যও লগ্নি করে। সে সময় কাশিমবাজারে তাঁতবস্ত্র রূপে তাঞ্জিব, আবরোয়া, আলাবলি, নয়নসুক, সরবতী, তেরিন্নদাম, সরকারআলি, জামদানি, হামাম, শীরবন্ধ, ডুবিরয়া, বাদানখাস এবং অতি সূক্ষ্ম 'খাস' ইত্যাদি নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট তাঁতবস্ত্র তৈরী হ'ত। সুতি কাটা কাপড়ের ব্যবসা ১৬৪০ থেকে শু(করে প্রায় দুশো বছর চালু ছিল।

কাশিমবাজারে প্রথম বাণিজ্য কুঠী কবে স্থাপিত হয় সে নিয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্যের অভাব থাকলেও ব্রুটনের বর্ণনানুসারে ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে কাশিমবাজারের কালিকাপুরের ওলন্দাজ কুঠীর পরিচয় মেলে। তবে ইংরেজ কুঠী স্থাপিত হয় প্রথম ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। জন কেন এই সময় বার্ষিক ৪০ পাউন্ড বেতনে কাশিমবাজার কুঠীর প্রথম অধ্য(হয়ে আসেন। সহকারী রূপে আসেন তিন জন পদস্থ কর্মচারী। তাঁরা হলেন ড্যানিয়েল শেলডন (দ্বিতীয় কাউন্সিল সদস্য, ৩০ পাউন্ড বেতন), জন প্রিডি (তৃতীয় সদস্য) এবং জব চার্ণক। বার্ষিক ২০ পাউন্ড বেতনের চতুর্থ কর্মচারীরূপে আসা চার্ণক ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে কাশিমবাজার কুঠীর অধ্য(নিযুক্ত(হন। জব চার্ণকের আমলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলায় বাণিজ্যের জন্য পাঠানো ২৩০,০০০ পাউন্ডের মধ্যে ১৪০,০০০ পাউন্ড কেবল কাশিমবাজারের জন্য বরাদ্দ করে। ১৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ বাংলার নবাব শায়েস্তা খাঁর আদেশে কাশিমবাজার কুঠী সাময়িকভাবে উঠে যায়। পরে আঠার শতকের প্রথমার্ধে ইংরেজরা আবার কাশিমবাজারে কুঠী স্থাপনের অনুমতি পায়।

১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে এখানে ভয়াবহ এক দুর্ভি(হয়। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ শে সেপ্টে স্বর কাশিমবাজারে হয় এক ভয়াবহ বন্যা, 'ক্যালকাটা গেজেটে' তার উল্লেখ আছে। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে হয় সাইক্লোন। ঐ সময়েই হয় ভয়ঙ্কর মহামারী (প্লে-গ)। এইসব কারণে এর অব্যবহিত পর থেকেই কাশিমবাজারের পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে। তাছাড়া ১৮০২ সালে অন্যান্য হিংস্র জন্তু সহ বাঘের উপদ্রব এত বেড়ে যায় যে কাশিমবাজার ত্র(মে জনশূন্য জঙ্গলে পরিণত হয়। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে সমৃদ্ধ কাশিমবাজার ধ্বংস হয়ে যায়। সাহেবরাও পা(বর্তী নতুন শহর বহরমপুরে বসবাস করতে শু(করেন।

অনেক উত্থানপতনের ইতিহাসের সা() কাশিমবাজার প্রাচীন ঐতিহাসিক নানা স্থান ও ব্যক্তি(র জন্য উচ্চগৌরব দাবি করতে পারে। সেইসব গু(ত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্য স্থানগুলির অধিকাংশ বিলুপ্ত হলে ও কয়েকটি নিদর্শন এখনও রয়েছে। । বর্তমানে দ্রষ্টব্য বলতে রয়েছে দুটি প্রাচীন রাজবাড়ি যার একটি ধ্বংসোন্মুখ, বিভিন্ন দেবদেবীর মন্দির এবং একটি বিখ্যাত শিবমন্দির (ব্যাসপুরে), মধুগড়ে পুকুর, কয়েকটি ছোট প্রাচীন

শিবমন্দির, ওয়ারেন হেস্টিংসের স্ত্রী ও কন্যার সমাধিসহ কয়েকজন ইংরেজদের সমাধি, একটি প্রাচীন মসজিদ, একটি প্রাচীন পীরের দরগা, সতীদাহ ঘাট, নীলের মাঠ (এখানে একসময় নীলের চাষ হ'ত), কাশিমবাজার-সংলগ্ন কালিকাপুরে ওলন্দাজদের সর্বপ্রাচীন সমাধি(ত্র প্রভৃতি।

এছাড়া বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য আরও কিছু দ্রষ্টব্য স্থান ছিল। সেগুলি হ'ল - জৈনদের বিখ্যাত নেমিনাথের মন্দির, ইংরেজদের রেসিডেন্সীর ধ্বংসাবশেষ, বহু প্রাচীন জৈন ও শিবমন্দির, ভাগীরথীর বাঁধানো সুদৃশ্য পাকা ঘাট এবং ইংরেজদের প্রধান জেটি (জাহাজ ঘাট)। ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংরেজদের রেসিডেন্সী সংলগ্ন ব্যবসা বাণিজ্য নির্বাহের জন্য নৌকা ও জাহাজ চলাচলের প্রধান জেটিটি বর্তমান ছিল আজ তার চিহ্(মাত্র নাই।

সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ আমলে কাশিমবাজার প্রধানত ছিল ব্যবসা বাণিজ্যে সমৃদ্ধ। কিন্তু অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতাব্দীতে কাশিমবাজার ব্যবসা বাণিজ্যের পাশাপাশি দুই রাজপরিবারের আভিজাত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেও ছিল ভাস্বর। কৃষ(কান্ত নন্দীর রাজবংশের ঐতিহ্যের নিদর্শন হিসেবে তাঁদের বাসস্থান 'মহারাজবাড়ি' বা 'বড় রাজবাড়ি' এখনো বর্তমান। এই অট্টালিকাটি মিশ্র স্থাপত্য রীতির অসামান্য নিদর্শন। কাশীরাজ চৈৎ সিংহের প্রাসাদ থেকে সংগৃহীত বালি পাথরের স্তম্ভ খিলানগুলি দেখবার মতো। খিলান ও চারপাশে সুন্দর কা(কাজ রয়েছে। কিন্তু উদাসীনতা ও অবহেলায় এই অট্টালিকাও প্রায় ধ্বংসের পথে।

এক সময় এই রাজবংশের রাজা হরিনাথ রায়, রাজা কৃষ(নাথ রায়, তাঁর সহধর্মিনী স্বর্ণময়ী এবং কৃষ(নাথের ভাগিনেয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর অবদান স্মরণীয় হয়ে আছে। রাজা হরিনাথের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে কাশী থেকে আগত ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্রে বিখ্যাত পন্ডিত কৃষ(নাথ ন্যায়পঞ্চানন কাশিমবাজারে অনেকগুলি চতুষ্পাঠী স্থাপন করে সংস্কৃত শি(াদানের ব্যবস্থা করেন। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এই চতুষ্পাঠীতে শি(ার্থীরা সমবেত হ'ত। হরিনাথের প্রচেষ্টাতেই ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১ নভেম্বর সৈদাবাদে জেলার প্রথম ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

হরিনাথের বিদ্যোৎসাহী পুত্র কৃষ(নাথের প্রচেষ্টায় 'মুর্শিদাবাদ নিউজ' নামে ইংরাজী দৈনিক প্রকাশ, 'মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী' নামে বাংলা দৈনিক প্রকাশ, মৃত্যুর আগে ইচ্ছাপত্রে কাশিমবাজার বানজেটিয়ায় বি(েবিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব, ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জুন কাশিমবাজার ও লণ্ডনের মধ্যে বাষ্পীয় জাহাজ চালানোর পরিকল্পনা প্রভৃতি জনহিতকর উদ্যোগ দেখা যায়। তাঁর সুযোগ্য সহধর্মিনী রাণী স্বর্ণময়ীর দানশীলতার কথা সকলেই জানেন। কৃষ(নাথের স্মৃতিধন্য স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা, ফরাসডাঙ্গা থেকে বহরমপুর ও কাশিমবাজারে পরিশুদ্ধ জল সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি নানাবিধ উদ্যোগ তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে। দানবীর রূপে খ্যাত এই বংশের সার্থক উত্তরাধিকারী মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর অবদানও সর্বজন বিদিত। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় কাশিমবাজার রাজবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে বাংলা ১৩১৪ সনের ১৭ ও ১৮ কার্ত্তিক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে প্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

কাশিমবাজারে আরও একটি রাজবাড়ি অতীত গৌরবের সা(িরূপে এখনও বিদ্যমান। 'ছোট রাজবাড়ি' নামে খ্যাত এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা অযোধ্যানারায়ণ রায়। জগবন্ধু রায়ের আমলে এঁদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। তিনি একসময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাশিমবাজার সংলগ্ন কুঠীর দেওয়ান ছিলেন। জগবন্ধুর পৌত্র বাবু নরসিংহ রায় তাঁর দানশীলতা ও উদার ব্যক্তি(ত্বের জন্য কাশিমবাজার অঞ্চলে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। এই বংশের বর্তমান উত্তরাধিকারী কুমার প্রশান্তকুমার রায়ের পিতামহ রাজা আশুতোষনাথ রায় বহরমপুরে তাঁর মা আন্নাকালীর নামে একটি হাসপাতাল গড়ে তুলবার জন্য ল(াধিক টাকা দান করেন। কিন্তু সেই টাকা কলকাতার লেডি ডাফরিণ হাসপাতাল তৈরীর কাজে ব্যয়িত হয়। এজন্য সরকার তাঁকে 'রাজা' উপাধি দান করেন। রাজা আশুতোষের মা আন্নাকালী দেবীও ছিলেন দানশীলা ও উদারচেতা মহিলা। কাশিমবাজার বিষু(পুরের ক(ণাময়ী কালীমন্দির জীর্ণ হয়ে পড়লে তাঁরই দানে তার সংস্কার করা হয়। আশুতোষ-পুত্র রাজা কমলারঞ্জন রায়ও একজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি(ছিলেন।

ছোট রাজবাড়ির স্থাপত্য কর্মেও সৌন্দর্যের পরিচয় মেলে। এর নাটমন্দির, দালানে পঙ্খের কাজ রয়েছে। এই রাজবাড়ির ভেতরে পূর্বদিকে অবস্থিত আশুতোষে(র শিব মন্দিরটি মিশ্র স্থাপত্যের অসাধারণ নিদর্শন।

নেমিনাথের মন্দিরের উত্তর-পূর্বদিকে অবস্থিত 'মধুগড়ে' নামে একটি জলাশয় রয়েছে। জনশ্রুতি, বর্গীর আত্র(মণের সময় জৈন ব্যবসায়ীরা তাঁদের বিপুল ধনসম্পদ এই পুষ্করিণীর গর্ভে লুকিয়ে রাখেন।

নেমিনাথ মন্দিরের খানিকটা উত্তর-পূর্বে কাটিগঙ্গার তীরে অবস্থিত কৃপাময়ী কালীমন্দির আধুনিককালের তৈরী হলেও বিগ্রহটি প্রাচীন। কালীমন্দিরের দ(িণ দিকে, প্রাঙ্গণের অন্যপ্রান্তে এক নবনির্মিত শিব মন্দিরের বারান্দায় 'মধুগড়ে' থেকে পাওয়া পাথরের একটি কালীমূর্তি

ও জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি আছে।

বড় রাজবাড়ির খানিকটা পূর্বদিকে অবস্থিত রাজবাড়ির ঠাকুরদালান ও দোতলায় অবস্থিত উনিশ শতকের শেষদিকে নির্মিত লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরটি বেশ সুন্দর। বারান্দা ও দালান কা(কার্য খচিত রক্ত(াভ গোলাপী বেলেপাথরের প্রায় একশোটি থাম ও পত্রাকৃতি খিলানে শোভিত। মন্দিরের ছোট বারান্দা ও উঠোনের চারপাশের দালানে পঙ্খের ফুলকারি নক্শা ও দেওয়ালে পঙ্খের কৃষ(লীলার দৃশ্য-শোভিত। প্রবেশদ্বারে খোদাই করা সুন্দর কাঠের কা(কার্য। থাম ও খিলানেও পঙ্খের কাজ। মন্দিরের গর্ভগৃহে শালগ্রাম শিলার লক্ষ্মীনারায়ণ, দ(ি ণাবর্ত শঙ্খ, একমুখ (দ্রা(এবং বেলেপাথরের থাম চৈৎ সিংহের প্রাসাদ থেকে সংগৃহীত। ছোট রাজাবাড়ির প্রাসাদের সামান্য উত্তর-পূর্বে বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন স্থাপত্যের নিদর্শন 'দশ শিববাড়ি'র মন্দিরগুলি উল্লেখযোগ্য ।

ছোট রাজবাড়ির পশ্চিমে রাস্তার উত্তরদিকে অবস্থিত তিন গম্বুজ বিশিষ্ট একটি প্রাচীন মসজিদ আছে। মোগল স্থাপত্যের নিদর্শন এই মসজিদ। আত্র(ম মহম্মদ আইনুদ্দিন নামে নবাব দরবারের একজন সভাসদ তথা ব্যবসায়ী আঠার শতকের প্রথমদিকে কাটরা মসজিদের অনুকরণে নাকি এটি নির্মাণ করেন।

'কাটিগঙ্গা' যাওয়ার প্রাচীন বাঁধানো রাস্তার পশ্চিমে ছিল 'রেসিডেন্সী'। ইংরেজ প্রতিনিধিরা এখান থেকেই দিল্লীর দরবারের সঙ্গে নিয়মিত ব্যবসা বাণিজ্য ও অন্যান্য বিষয়ে যোগাযোগ রাখতেন। 'রেসিডেন্সী' বর্তমানে লুপ্ত।

পূর্বতন রেসিডেন্সীর বিপরীত দিকে অবস্থিত প্রাচীন ইংরেজদের সমাধিস্থল একটি উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য স্থান। এই সমাধি(ত্রে এখন মোট ১৮টি সমাধি রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সমাধিটি হল ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রথমা পত্নী মেরী এবং কন্যা এলিজাবেথের।

কাশিমবাজার রেসিডেন্সী (হাতাবাগান) সংলগ্ন কাটিগঙ্গার তীরে রয়েছে 'নীলের মাঠ'। একসময় এই মাঠ সংলগ্ন বিস্তৃত অংশ জুড়ে নীলকুঠীর সাহেবরা চাষীদের দিয়ে নীল চাষ করাতেন। এরই পাশে ভাগীরথীর তীরে এক সময় অবস্থিত ছিল ইংরেজদের বাণিজ্যতরী ও জাহাজ ভিড়বার জন্য একটি সুদৃশ্য বিশাল জেটি। এর চলতি নাম 'জাহাজ ঘাট'। জেটিটি তৈরী হয় ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে। বন্যার কবল থেকে র(া করবার জন্য এটি প্রায় ষাট ফুট উচ্চতার তৈরী হয়। দুপাশে ছিল প্রায় ৪০০ ফুট লম্বা মজবুত পাকা ইঁটের দেওয়ালে বাঁধানো নদীর পাড়।

রেসিডেন্সীর অপরদিকে কাটিগঙ্গার একটি অংশ এখনও 'সতীদাহ ঘাট' নামে পরিচিত। হলওয়েল সাহের এই 'সতীদাহ ঘাট' এর কথা উল্লেখ করে গিয়েছেন। এর আশে পাশে একসময় অনেক শিবমন্দির ছিল।

কাশিমবাজার ছোট রাজবাড়ির পাড়ায় ছোট রাজার যে সুউচ্চ রথ ঘরটি রয়েছে, তার পূর্বদিকে 'হাতারবাগান' সংলগ্ন একটি প্রাচীন পীরের দরগা আছে। এটি 'কাশিমবাবার থান' নামে পরিচিত। এই দরগাটিই বিখ্যাত ফকির সৈয়দ কাশিমের দরগা। এর নামানুসারেও কাশিমবাজারের নামকরণ করা হয়ে থাকতে পারে।

কাশিমবাজার ঝাউখোলা ও দয়ানগরের মাঝামাঝি অংশে খাগড়া সৈদাবাদ থেকে বিষ(ুপুর যাওয়ার যোগাযোগ র(াকারী বিখ্যাত সেতু 'হোতার সাঁকো' বিদ্যমান। অষ্টাদশ শতকে ইংরেজ কুঠীর কর্মচারী, পরে ধর্মপ্রাণ ও দানশীল রূপে বিখ্যাত কৃষে(ন্দ্র হোতা এটির নির্মাতা। হোতার দানশীলতা ও ধর্মপ্রাণতার আর একটি নিদর্শন কাশিমবাজার থেকে বহরমপুর বাসস্ট্যান্ডের দিকে যাওয়ার রাস্তায় বিষ(ুপুরে অবস্থিত 'ক(ণাময়ী' কালিমন্দির।

অতীতের কাশিমবাজার বর্তমানে স্মৃতিমাত্র। এর প্রাচীন ঐতিহ্যমন্ডিত স্থানের অধিকাংশই লুপ্ত। সোরাখানা (যেখানে সোরা জমা করা হ'ত), হাতারবাগান বা রেসিডেন্সী , ফাঁসিতলা (দুর্জনদের বা ব্রিটিশ বিরোধীদের ফাঁসি দেওয়ার উঁচু মঞ্চ), বানকবাগান (অর্থাৎ রেশমবাগান) ইত্যাদি ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নামগুলিই রয়েছে মাত্র। স্থানগুলিতে প্রাচীন নিদর্শনের সামান্য অবশেষও নাই। কাজেই এই স্থানগুলির চেহারা কেমন ছিল তা অনুমানযোগ্য, প্রমাণসাধ্য নয়। ১৮৫৮ থেকে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই ইংরেজ কোম্পানী জায়গাগুলি বিক্রি(করে দেয়।

কাগ্রাম ঃ সালার থেকে ৭ কিমি দূরত্বে অবস্থিত এই গ্রাম সেন আমলে স্থাপিত বলে অনেকে মনে করেন। গ্রামের উত্তরে বাবলা বহড়া, পশ্চিমে সালার, দ(ি ণে কৃষ(দাস কবিরাজ গোস্বামীর জন্মস্থান ঝামটপুর (বর্ধমান জেলা)।

গ্রামটির নামকরণের ইতিহাসের ব্যাপারে যেটা শোনা যায় তা হ'ল, কঙ্ক চন্ডীর নাম অনুসারেই গ্রামটির এইরূপ নামকরণ। কঙ্কন নামে এক রাজার রাজধানী ছিল বলেও শোনা যয়া। কাগ্রাম সেন আমলের কঙ্কগ্রাম (ভূক্তি) বলে মনে করা হয়। এই গ্রামে ৬টি শিবমন্দির, তারামায়ের মন্দির, কামাইচন্ডী ও ধর্মরাজের মন্দির ইত্যাদি আছে। দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতায় ৩ - ৩- ১০ মিটার, রায় চৌধুরীদের ঠাকুরবাড়ীর উত্তরপূর্বে রেখ দেউল রীতির একজোড়া শিবমন্দির গ্রামের প্রধান পুরাকীর্তি। পোড়া মাটির অলংকরণে সমৃদ্ধ। বিষয়বস্তু প্রতীকি

শিবমন্দির, দশাবতার, পৌরাণিক দেবদেবী, রামায়ণ কাহিনী, লঙ্কাযুদ্ধ, হংসলতা ইত্যাদি। গ্রামটি প্রাচীন ও সমৃদ্ধ।

কান্দী ঃ 'উত্তররাঢ়ী কায়স্থ-কারিকা' অনুসারে বনমালী সিংহ অনুমানিক বার-তের শতকে বন কেটে কান্দীর পত্তন করেন। এখানকার বর্তমান রাজবংশের ইতিহাস প্রকৃতপ(আলীবর্দীর সমসাময়িক হরকৃষ(সিংহ থেকে পাওয়া যায়। রাধাবল্লভের বিগ্রহ ও মন্দির ছাড়া তাঁদের প্রতিষ্ঠিত তেমন কোন পুরাকীর্তি কান্দীতে নেই। এই বংশের কৃষ(চন্দ্র সিংহ ('লালাবাবু') অবশ্য বৃন্দাবনে মন্দিরাদি স্থাপন করেছিলেন। স্থানীয় পুরাকীর্তির প্রায় সবই কান্দীর অন্তর্গত জেমো ও বাগডাঙ্গার রাজাদের প্রতিষ্ঠিত। তাঁরা ইতিহাসখ্যাত 'ফতেসিংহ'র অধিপতি সবিতাচাঁদ রায়ের (অথবা দী(তের) বংশধর।

রাধাবল্লভ জীউর প্রাসাদতুল্য বিশাল দোতলা দালান - মন্দিরটি কান্দী রাজবাড়ির মধ্যে অবস্থিত। গৌরাঙ্গ সিংহ মজুমদার (জন্ম ১৬৯৯ খ্রীঃ), মতান্তরে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও দত্তকপুত্র রাধাকান্ত, এই বিগ্রহ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ বর্তমান বৃহৎ দেবালয়টি নির্মাণ করেন। নাটমন্দিরটি নিতান্তই আধুনিক। কষ্টিপাথরের রাধাবল্লভ জীউ ও পিতলের রাধিকা ছাড়াও এখানে আরও অনেক বিগ্রহ (জগন্নাথ, রাধাকান্ত, গোপাল, গোপীনাথ, মদনমোদন প্রভৃতি) উপাসিত। এ-দেবগৃহের প্রবেশপথের বিস্তৃত অঙ্গনে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের প্রতিষ্ঠিত প্রাচীনতর আর একটি একতলা দালান-মন্দির গোবিন্দজীর। দ(ণমুখী এ- মন্দিরের তিন দিকে পাঁচটি করে পত্রাকৃতি খিলান, খিলানের দুই পাশে গোল স্তম্ভগুচ্ছ এবং প্রতিটি খিলানের উপর বাংলা - মন্দিরের কার্নিসের মতো কার্ণিস স্থাপত্য - প্রকরণের অভিনবত্বের জন্য ল(ণীয়।

জেমো ঃ 'আকবর বাদশার রাজত্বকালে রাজা মানসিংহের সেনাধ্য(উত্তরপ্রদেশের ঝিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ সবিতা চাঁদ রায় (দী(ত) হাড়ি রাজা ফতেসিংহকে পরাস্ত করে ফতেসিংহ ও পলাশি পরগণা দখল করেন'। এই সবিতা রায়ই জেমো রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমান জেমো রাজবাড়ির অবস্থানকাল আনুমানিক দেড়শ বছর। কিন্তু সংলগ্ন এলাকায় সেই প্রাচীন বংশ ঐতিহ্যের কিছু নমুনা আজও দেখা যায়। এখানকার অন্নপূর্ণা মন্দিরে এবং পা(র্ববর্তী রাধাকৃষে(র মন্দিরে বেশ কতকগুলো নয়নাভিরাম মূর্তি দর্শনার্থীদের মনোরঞ্জন করতে পারে। অষ্টধাতু নির্মিত অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী, পঞ্চমুখী শিব, বিষু(ও গণেশ এই পঞ্চ বিগ্রহ নিয়েই অন্নপূর্ণা মন্দির। অষ্টধাতুর রাধা ও কষ্টি পাথরের কৃষ(মূর্তি দুটিও প্রাচীন। অন্নপূর্ণা মন্দিরের প্রবেশদ্বারের গাত্রে ফুলকারি কাজ এবং সুবিশাল উচ্চতা থেকে প্রাচীনত্বের নমুনা মিললেও প্রকৃত অর্থে কত প্রাচীন তা নিয়ে বিভিন্ন মত ও সন্দেহের অবকাশ আছে। জেমো রাজবাড়ির উত্তর-পূর্ব কোণের নতুন বাড়িতে স্বনামধন্য বিজ্ঞানাচার্য সাহিত্য সাধক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর জন্ম। তাঁর সূতিকা গৃহটি আজও অটুট রয়ে গেছে।

বাইচন্ডীতলা ঃ জেমো রাজবাড়ির অদূরে বাইচন্ডীতলা মন্দিরে অষ্ট ধাতু নির্মিত চার হাত বিশিষ্ট একটি দুর্গা মূর্তি দেখা যায়।

বাগডাঙ্গা ঃ বাগিচা থেকে বাগ এবং বাগ থেকেই বাগডাঙ্গা। বাগডাঙ্গা নামের উৎপত্তি বিষয়ক এইরকম মতই পাওয়া যায়। রাজা সূর্যমণি চৌধুরী এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এখানকার সূর্যে(র মন্দির, সিংহবাহিনী মন্দির ও কালী(র শিবমন্দির এবং একই অঙ্গনে অবস্থিত এয়োদশ শিবমন্দির দর্শনার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বর্তমানে জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় প্রায় বিধ্বস্ত একবাংলা সূর্যে(র মন্দিরটি বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। মন্দিরের খিলান শীর্ষে উন্নত ধরনের টেরাকোটা সজ্জা দেখা যায়। জানা যায় সতের শতকের শেষে অথবা আঠার শতকের প্রথমে এটি প্রতিষ্ঠা করেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা সূর্যমণি চৌধুরী।

'কালী(র' মন্দির অর্থাৎ পঞ্চমুখী শিবমন্দিরটি রাজা কালীশঙ্কর রায় প্রতিষ্ঠা করেন আনুমানিক ১১৫০-৫২ বঙ্গাব্দে। এর দুপাশে দন্ডায়মান তেরটি শিবমন্দির। পূর্বমুখী কালী(র মন্দিরটি সোজা কার্ণিসের এক পঞ্চরথ নবরত্ন দেবালয়। চতুর্দশ শিবমন্দিরের উত্তরদিকে সিংহবাহিনী মন্দির। প্রতিষ্ঠাকাল ১১০২ বঙ্গাব্দ। প্রতিষ্ঠাতা রাজা কালীশঙ্করের মা পার্বতীদেবী।

রূপপুর ঃ রূপপুরে প্রতিষ্ঠিত (দ্রদেবের মন্দির। এর ধর্মীয় খ্যাতি প্রচুর। নির্মাণকাল সতের শতকের শেষাশেষি। কথিত আছে জেমো ও বাগডাঙ্গা রাজাদের দ্বারাই এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। মূল (দ্রদেবের মন্দিরের দুপাশে আরও চারটি শিবমন্দির। মন্দিরের সাবেক (দ্র মূর্তিটি চুরি গেলে বর্তমানের মূর্তিটির প্রতিষ্ঠা হয় ১৩৭০বঙ্গাব্দে। মন্দিরের প্রবেশদ্বারের গাত্রে লঙ্কাযুদ্ধের পোড়ামাটির সজ্জা বিশেষ ল(ণীয়। এ মতও প্রতিষ্ঠিত আছে যে, কামদেব ব্রহ্মচারী নামক এক সাধু এই মন্দিরের (দ্র মূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করেন। চৈত্র সংক্র(ান্তির আগের দিন 'বাবা'র পূজাকে কেন্দ্র করে হাজার হাজার মানুষের উন্মাদনা ল(ণীয়। বাবার এই 'হোম পূজাকে' কেন্দ্র করে হোমের মেলা পুরাতন হাটে অনুষ্ঠিত হয়। 'বাবা' অর্থাৎ ভোলা (দ্র। আসলে ভূমি স্পর্শ মুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি। মূলত অন্ত্যজ শ্রেণী থেকেই এই হোম পূজার ভক্ত(নির্বাচিত হয়।

কিরীটেশ্বরী ঃ ভাগীরথীর পশ্চিমপাড়ে ডাহাপাড়া গ্রাম থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে গেলে কিরীটেশ্বরী পৌঁছান যায়। ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে পলসন্ডা মোড় থেকেও কিরীটেশ্বরী যাওয়া যায়।

নবগ্রাম থানায় কিরীটেশ্বরী মৌজায় কিরীটেশ্বরী মন্দির সম্ভবত এ জেলার প্রাচীনতম মন্দির। মন্দিরটি যে গ্রামে অবস্থিত দেবীর নাম অনুসারে তার নামও কিরীটেশ্বরী। ফার্সী ভাষায় লেখা, আঠার শতকের শেষে রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ রিয়াজ-উস্- সালাতিনে এবং রেনেলের প্রাচীন মানচিত্রে তি(থকোনা নাম পাওয়া যায়। তাছাড়া ভবিষ্যপুরাণের ভৌগোলিক বিবরণ ব্রহ্মান্ড অধ্যায়ে কিরীটকোনার উল্লেখ আছে। বিভিন্ন তন্ত্র গ্রন্থেও কিরীটেশ্বরী বা কিরীটকোনার নাম মেলে। কিরীটেশ্বরীর প্রাচীনত্ব ও ঐতিহাসিক গু(ত্ব সম্পর্কে কোন সংশয় থাকতে পারে না। পীঠনির্ণয়তন্ত্র ও পুরাণ কাহিনী অনুসারে দ(যজ্ঞে সতীর মুকুট এসে পড়েছিল এখানে। এজন্য একে মহাপীঠ বলে। আবার দেহের অংশ না পড়ে এখানে দেবীর দেহের ভূষণ পড়েছিল বলে এই জায়গাটিকে উপপীঠও বলে। এখানে দেবীর নাম বিমলা, ভৈরব সম্বর্ত। একসময় ডাহাপাড়ার বঙ্গাধিকারীগণের এবং রাণী ভবানী, রাজা রামকৃষ(, রাজা রাজবল্লভ প্রভৃতির সহযোগিতায় এবং নবাবগণের পৃষ্ঠপোষকতায় কিরীটেশ্বরী বহু মন্দিরে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। বর্তমানে অধিকাংশ মন্দির ভগ্ন অথবা ভগ্নপ্রায়। কিরীটেশ্বরীর আদি দ(ি ণমুখী মন্দিরটি বর্তমানে লুপ্ত। গ্রামের দ(ি ণ অংশের অনেকখানি জায়গা জুড়ে কিরীটেশ্বরীর বর্তমান মন্দির ও আরও কয়েকটি মন্দির। আদি মন্দিরটি ১৪০৫ খ্রীষ্টাব্দে তৈরী বলে মনে করা হয়। সেটি লুপ্ত হলে আঠার শতকের প্রথমদিকে পশ্চিমমুখী বর্তমান মন্দিরটি তৈরী করেন কানুনগো বঙ্গাধিকারী দর্পনারায়ণ। মন্দিরটিতে মুসলিম স্থাপত্যের প্রভাব ল(ণীয়। গর্ভগৃহে বিগ্রহ নাই, মন্দিরের ভেতর একটি মর্মরবেদীর ওপর কালো পাথরের পীঠিকা। সম্ভবত তার ওপর ছিল দেবীর কিরীট। এখন ঐ কিরীট (কিংবা মতান্তরে কপালের হাড়) গ্রামের একধারে 'গুপ্তমঠ' নামক মন্দিরে লাল রেশমী কাপড়ে মুড়ে একটি কলসে রাখা আছে। সাধারণ মানুষ তা দেখতে পায় না।

কিরীটেশ্বরী মন্দিরের দ(ি ণ - পূর্বে দর্পনারায়ণ কালীসাগর নামে একটি বিশাল পুষ্করিণী খনন করেন। একটি লুপ্ত মন্দিরের প্রস্তর ফলকে লেখা আছে 'সাকে সপ্তাষ্ট কালেন্দু সংখে শম্ভুপ্রিয়ে পুরে সভারাম সুতোহকার্ষীদ্রঘুনাথ মঠং শুভং'। যার অর্থ ১৩৮৭ শকাব্দে অর্থাৎ ১৪৬৫-৬৬ খ্রীষ্টাব্দে সভারামপুত্র রঘুনাথ কিরীটেশ্বরীতে এই শুভ মন্দির নির্মাণ করেন। প্রস্তর ফলকটি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বে(ণের হেফাজতে। অন্যান্য বহু স্থানের মত কিরীটেশ্বরীও বৌদ্ধ প্রভাব মুক্ত(নয়। এখানকার ভৈরব মন্দিরে যিনি ভৈরব বলে পূজিত হতেন তিনি আসলে ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি। এই মূর্তিটি রায়বাহাদুর সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ কর্তৃক সংগৃহীত হয়ে জিয়াগঞ্জের মুর্শিদাবাদ সংগ্রহশালায় র(ি ত আছে।

রিয়াজ - উস্- সালাতিন অনুযায়ী বিদ্রোহী আফগান নেতা মীর হাবিব মুর্শিদাবাদ আত্র(মণ ও জগৎশেঠের কোষাগার লুঠ করার আগে এই কিরীটেশ্বরীতেই তাঁর সঙ্গের মারাঠী সৈন্যদের শিবির স্থাপন করেন। অপর প্রসিদ্ধ ফার্সী গ্রন্থ সিয়ার-উল্-মুতা(রীণে মৃত্যুকালে নবাব মীরজাফর কর্তৃক কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত পানের উল্লেখ আছে।

পৌষমাসে প্রতি শনি মঙ্গলবার এখানে মেলা বসে। গ্রাম্য মেলার সহজ সরল রূপ এখনও বজায় আছে এই মেলায়। মেলায় আদিবাসী মহিলাদের ভিড় ল(্য করার মত। কাছাকাছি অনেকগুলি আদিবাসী গ্রাম আছে।

খে(র ঃ ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে বহরমপুর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অথবা রঘুনাথগঞ্জ থেকে ১৩ কিলোমিটার দ(ি ণ-পশ্চিমে সেখের দীঘি বা সেখদীঘি। সেখান থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার দ(ি ণপূর্বে সাগরদীঘি থানার অন্তর্গত (ুদ্র গ্রাম খে(র। এখানকার সুলতানী আমলের একটি পুরাতন মসজিদ গ্রামটিকে বিখ্যাত করেছে। প্রাক্-মোগল স্থাপত্যের নিদর্শন এই সুদৃশ্য মসজিদটি গৌড়ের মসজিদগুলির সমগোত্রীয়। আগাগোড়া পোড়ামাটির সজ্জায় অলঙ্কৃত এই মসজিদের অনুরূপ আর কোন মসজিদ মুর্শিদাবাদ জেলায় বর্তমানে নাই। মসজিদটির এখন জীর্ণদশা। তিন গম্বুজ-বিশিষ্ট বারান্দা সমেত মসজিদটি এককালে যে অসাধারণ সৌন্দর্যমণ্ডিত ছিল তাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে মসজিদের প্রার্থনাক(ে র উপর বৃহৎ গম্বুজটি ১৩০৪ (১৮৯৭) সালের ভয়াবহ ভূমিকম্পে ভেঙ্গে যায়। চার দিকের চারটি মিনার ভেঙ্গে পড়েছে। পোড়ামাটির অলঙ্করণে সুসজ্জিত মসজিদের ভিতরের দেওয়ালে তিনটি মিহ্রাবেরও জীর্ণ-দশা। তবু মসজিদটি এখনও দর্শকের বিস্ময় উদ্রেক করে।

মসজিদের সামনের দেওয়ালে প্রধান প্রবেশদ্বারের উপর গ্রথিত আরবী ভাষার প্রতিষ্ঠালিপি অনুসারে মসজিদের নির্মাণকাল ৯০০ হিজরি অর্থাৎ ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দ। নির্মাণ করেন খাঁ মহম্মদ রিফাৎ খাঁ। তিনি সম্ভবত গৌড়ের বাদশাহ্ হুসেন শাহ্-এর একজন সেনাপতি ছিলেন। ঐ লিপির নিচে গ্রথিত আর একটি লিপি থেকে জানা যায় মুয়াজ্জাম খাঁ আর একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। তবে সেটির এখন অস্তিত্ব নাই।

খে(রে ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দে মাটির নীচে পাল-সেন যুগের একটি

আংশিক ভগ্ন কালো পাথরের নাতিউচ্চ স্থানক বিষু(মূর্তি পাওয়া যায়। এখানে দু-একটি প্রাচীন শিবমন্দিরের অস্তিত্বের নিদর্শন আছে। এই সব নিদর্শন থেকে মনে হয় খে(র গ্রামটির অস্তিত্ব পাল-সেন যুগেও বর্তমান ছিল। সুলতানী আমলে এই অঞ্চল যে রীতিমত সমৃদ্ধিশালী ছিল তা নিকটবর্তী মণিগ্রাম, চাঁদপাড়া (হুসেন শাহ্ এর স্মৃতি বিজড়িত) প্রভৃতি জনপদের অবস্থান থেকেই বোঝা যায়।

খোশবাগ ঃ খোসবাগের উঁচু প্রাচীরে ঘেরা সমাধি(ত্রটি আলীবর্দী খাঁ তাঁর মায়ের কবর দেওয়ার উদ্দেশ্যে তৈরী করেন ১৭৪০ এ। তোরণটি যথেষ্ট উঁচু। প্রাচীরের কোল ঘেঁসে ভাগীরথী বয়ে যেত। ভাগীরথী এখন অনেকটাই সরে গেছে। বড় বড় ছায়াঘন গাছে ফুলবাগানে সর্বদা মনোরম হয়ে থাকত বলে সমাধি(ত্রটির নাম খুশবাগ বা খোশবাগ। সমাধি(ত্রটি মাঝখানে উত্তর-দ(ণে একটি বড় দেওয়াল দিয়ে বিভক্ত(। প্রথম চত্বরে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা খোলা জায়গায় তিনটি সমাধি, পূর্বদিকের প্রথম সমাধিটি আলীবর্দীর মায়ের, বাকী সমাধি দুটি কার বলা যায় না। প্রথম চত্বরের উত্তরদিকে ১৭টি কবরের নাম ঠিকানা জানার উপায় নেই। দ্বিতীয় চত্বরে আট দুয়ারীর ছোট্ট সৌধের মধ্যে আটটি সমাধি। আলীবর্দী, সিরাজ, লুৎফুন্নেসা, শরফুন্নিসা, মীর্জা মেহেদির এবং সম্ভবত উমদুতেন্নিসার সমাধি, বাকী দুটি ঘসেটি ও আমিনার বলে জানান হয়। কিন্তু ঢাকার বুড়িগঙ্গায় নৌকাডুবিয়ে ওদের মারা হয়েছে, ওদের সমাধি এখানে থাকা সম্ভব নয়, তবে পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত কারও হতে পারে। দ্বিতীয় চত্বরের শেষপ্রান্তে প্রথানুযায়ী একটি মসজিদ আছে। প্রথম চত্বরের দ(ণ দিকে একটি উঁচু ঢিবিকে লুৎফুন্নেসার বাসগৃহের স্থান বলে নির্দেশ করা হয়। সিরাজের মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল সিরাজ-বেগম লুৎফুন্নিসা এখানকার সমাধিস্থানের পরিচর্যা করেন। পাটনায় হাজী আহমদের কবরের দেখাশোনার দায়িত্বও তাঁকে দেওয়া হয়। তিনি এজন্য তাঁর মাসিক বৃত্তি ১০০ টাকা ছাড়াও আরও ৩০৫ টাকা পেতেন। লুৎফুন্নিসার মৃত্যুর পর কন্যা ওমদৎউন্নিসার বংশধরেরা খোশবাগের দেখাশোনা করতেন, পরে ইংরেজ সরকার নিজেই দায়িত্ব নেয়। বর্তমানে ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক সর্বে(ণ দেখাশোনা করে।

গিয়াসাবাদ ঃ জঙ্গীপুর মহকুমার সাগরদীঘি থানার অধীন গিয়াসাবাদ। গিয়াসুদ্দিনের নাম থেকে এ স্থানের নাম যে গিয়াসাবাদ হয়েছে এ ব্যাপারে সবাই স্থির নিশ্চিত। কিন্তু কে এই গিয়াসুদ্দিন? কেউ বলেন, গৌড়ের পাঠান সুলতান গিয়াসুদ্দিন ইউয়জ শাহ্, কেউ বলেন- গিয়াসুদ্দিন বাহাদুর শাহ। কথিত আছে - সুলতান গিয়াসুদ্দিন পাল রাজাদের রাজধানী 'মহীপাল নগর' ধ্বংস করে, এখান থেকে পাওয়া বহু পাথরের জিনিস ও মালমশলা দিয়ে 'গিয়াসাবাদ নগর' নির্মাণ করেন। গিয়াসাবাদের পূর্বনাম বদ্রীহাট (ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়ের মতে 'ভাদুরীহাট') নাম পরিবর্তন করে করে 'গিয়াসাবাদ' রাখেন। গিয়াসাবাদ পায় নগরের মর্যাদা। এককালে পরগণা ছিল গিয়াসাবাদ।

গবেষকদের মতে, গিয়াসাবাদ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পাঠান রাজত্বকালে সৃষ্ট। ক্যাপ্টেন ডব্লিউ.এইচ. শেরউইল তাঁর এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন, গিয়াসাবাদ কোন প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ। ক্যাপ্টেন জে. ই. গ্যাসট্রেল বলেন- গিয়াসাবাদ অথবা বদ্রীহাট ভাগীরথীর তীরে। এর কাছাকাছি পুরানো মাটির পাত্র ও পুরানো কুয়োর ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। পুরানো কেল্লা বা প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ থেকে এটা স্পষ্ট যে, এ স্থান একটি প্রাচীন নগরের অবস্থানভূমি। তাছাড়া বহরমপুরের তৎকালীন এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ক্যাপ্টেন লেয়ার্ড ঐতিহাসিক অনুসন্ধান শেষে জানান- বদ্রীহাট(গিয়াসাবাদ) একটি ঐতিহ্যশালী বৌদ্ধ জনপদ ছিল। তিনি গিয়াসাবাদ থেকে সূক্ষ্ম কা(কার্যময় পাথরের থাম, পালি ভাষার শিলালিপি, বহু খন্ডিত পাথর, বিভিন্ন পাথরের মূর্তি, জামার বোতামের আকারের স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করে ১৮৫২ সালে তিনি সিদ্ধান্তে আসেন গিয়াসাবাদ একটি বৌদ্ধ জনপদ ছিল । গিয়াসাবাদে প্রাপ্ত পালি ভাষার শিলালিপি এবং স্বর্ণমুদ্রা তিনি 'এশিয়াটিক সোসাইটি'তে পাঠিয়েছিলেন। এখানে একটি প্রাচীন মুসলিম সমাধি আছে। ক্যাপ্টেন লেয়ার্ড বলেন, এটা গৌড়ের রাজার সমাধি। মনমোহন চত্র(বর্তী ১৯০৮-এ অনুমান করেন যে, এটি লাখমন্তীর সমাধিও হতে পারে। স্থানীয় মানুষেরা বলেন, এখানে পীর গিয়াসুদ্দিনের ও তাঁর নিকট আত্মীয়ের কবর ও মাজার আছে। দরগার দ(ণে আট কোণা চূড়াসহ একটা প্রাচীন শিব মন্দির আছে। এই শিবমন্দির একটু পূর্বে ভাগীরথীর তীরে 'তুলসী বিহার মন্দির'। আঠার দশকের শেষে কি উনিশ দশকের প্রথমদিকে নসীপুররাজ উদবন্ত সিং এই মন্দির তৈরী করান। আটকোণা গম্বুজ বিশিষ্ট পঞ্চরত্ন মন্দির। ৪টি প্রবেশ দ্বার। দোতলায় বারান্দা ও মূলমন্দির। বারান্দা, ছাদ, গম্বুজ ভাঙা। দরজা মূর্তি কিছুই নাই। দরগার পশ্চিমে একটি ঐতিহাসিক প্রাচীন মসজিদ আছে।

পীরের দরগার উত্তর ও পূর্বদিক ভাগীরথী প্রায় স্পর্শ করায় দা(ণ বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। যে কোন সময় ভাগীরথীর গর্ভে যেতে পারে। বাইরের দেওয়ালটি খোদাই করা কালো পাথর একের পর এক সাজিয়ে তৈরী। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা দ(ণমুখী সিঁড়িগুলিও

কালো পাথরের। উপরে আছে অপূর্ব কা(কার্য মন্ডিত ঝন্কাঠ। চৈত্র মাসের প্রথম সোমবার এখানে গিয়াসুদ্দিন পীর সাহেবের 'উরস' ও মেলা হয়। গিয়াসাবাদের রাস্তা ঘাটে, মাটির নিচে- চাল্তাবাড়ি, হুকার হাট, গৌরীপুর, পাটকেলডাঙা প্রভৃতি গ্রামে পাথরের ভাঙা টুকরো, বড় বড় বিভিন্ন আকারের পাথর, পাথরের স্তম্ভ, পাথরের বিষু(মূর্তি, সোনার গণেশ মূর্তি, পাথরের শিব লিঙ্গ, বুদ্ধ মূর্তি পাওয়া গেছে। অনেকগুলো অবহেলায় পড়ে আছে। চাষ করতে গিয়ে গৌরীপুর লক্ষ্মীডাঙ্গার মাঠে অনেকে স্বর্ণমুদ্রা পেয়েছেন।

গিয়াসাবাদ যাওয়ার যোগাযোগ ব্যবস্থা সন্তোষজনক নয়। ৪ কিমি দ(ি ণ-পশ্চিমে মহীপাল রোড স্টেশন (আজিমগঞ্জ-বারহাড়োয়া লাইনে)। জিয়াগঞ্জ-ভগবানগোলা ভাগীরথী নদীপথে নৌকায়, ভট্ভটিতে আসা যায়। এখান থেকে ভগবানগোলা ৮ কিমি উত্তর-পূর্বে, আজিমগঞ্জ ৮ কিমি দ(ি ণে, বারালা স্টেশন (আজিমগঞ্জ-নলহাটী লাইনে) ১০ কিমি দ(ি ণ-পশ্চিমে।

আজিমগঞ্জ সিটি রেল স্টেশন থেকে ৪ কিমি উত্তরে বিনোদ গ্রাম। এখানে প্রায় তিনশো বছর আগের বৈষ(ব আখড়া এবং বড় দালান মন্দিরে কষ্টিপাথরের গোকুলচাঁদ বিগ্রহ আছে। বৈষ(ব বিনোদ বিহারী দাস এর প্রতিষ্ঠাতা।

মহীপাল রোড স্টেশনের প্রায় ৩ কিমি উত্তরে সিংহ(েরী। আগে গঞ্জ ছিল। পঞ্চ রত্নের মন্দিরের মূল চূড়াটি বড়। আটকোণা, গম্বুজাকৃতি। উচ্চতা ৬ মিটার। মন্দিরের মিনার, স্তম্ভ ভেঙে পড়েছে। মন্দিরের গর্ভগৃহে দেওয়ালে লাগানো সিংহবাহিনী মূর্তিটি র(ণাবে(ণের অভাবে চুরি হয়ে গেছে। মন্দিবের স্থাপত্য শৈলীতে মুসলিম প্রভাব ল(্য করা যায়।

মহীপাল রোড স্টেশনের ৪ কিমি পূর্বে ভুঁইহাটে একটা ভাঙা প্রাচীন মসজিদ আছে। এর খিলানগুলি ভাঙা। উত্তর-দ(ি ণ দিকে খিলানে চুনবালির ফুল লতাপাতার অলংকরণ ও পঙ্কের কাজ ছিল। তিনটি গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটিকে মোগল যুগের বলে চিহ্নি(ত করা হয়।

গোকর্ণ ঃ গোকর্ণ জনপদটি কান্দী মহকুমায়। মুর্শিদাবাদের সদর শহর বহরমপুর থেকে কান্দী যাওয়ার রাস্তায় বহরমপুর থেকে ১৩ কিমি দূরে এই সুপ্রাচীন বিশাল গ্রামখানি। রাঙামাটি-চাঁদপাড়া বা কর্ণসুবর্ণ থেকে ৮ কিমি পশ্চিমে গোকর্ণ। এখানে নাকি রাজা শশাঙ্কের গোশালা ছিল তাই নাম গোকর্ণ। শৈব রাজা গোকর্ণে(রের শিব প্রতিষ্ঠা করেন।

স্থানীয় জমিদারদের ছোট তরফের ঠাকুরবাড়ীতে সিংহবাহিনীর পশ্চিমমুখী দালান মন্দির আছে।এখানে সিংহবাহিনী মন্দিরে লক্ষ্মী-সরস্বতী-কার্ত্তিক-গণেশ সমেত অষ্টধাতু নির্মিত সিংহবাহিনী মূর্তি ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বলে শোনা যায়। গ্রামের প্রধান সড়কের পশ্চিমদিকে ষোড়শ শতকে প্রতিষ্ঠিত টেরাকোটা কাজ করা নৃসিংহদেবের মন্দির। প্রাচীন বাংলা হরফে সংস্কৃত ভাষার লিপি অনুসারে ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে মন্দিরটি সংস্কার করা হয়েছে। বাংলার এই সুপ্রাচীন মন্দিরটির স্থাপত্য ও পোড়ামাটির ভাস্কর্যে মুসলিম প্রভাব ল(্যণীয়। বিকশিত শতদলের উপর হিরণ্যকশিপুর উদর বিদারণরত নৃসিংহদেবের ষড়ভূজ মূর্তিটি কষ্টি পাথরের, উচ্চতা প্রায় পঞ্চাশ সেন্টিমিটার। এটি পালযুগের ভাস্কর্য বলে মনে করা হয়। এই মন্দির প্রাঙ্গণের পশ্চিম পাশে কয়েকটি শিবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ সহ প্রায় আঠারটি শিব মন্দির চোখে পড়ে। গ্রামের নিমুরায় শিবমন্দির এবং রায় বাড়ির সন্নিকটস্থ শিবমন্দির তিনটিও উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও গ্রামের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অধুনা সংস্কার করা কয়েকটি প্রাচীন মন্দির, ভগ্নপ্রায় ও ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া মন্দির। গ্রামের দ(ি ণ দিকে কালু পীরের আস্থানা এবং গ্রামের পাঁচটি ধর্মরাজতলা উল্লেখযোগ্য। অতীতে গোকর্ণে রেশম শিল্প গড়ে উঠে ছিল। একটি রেশমকুঠীর ধ্বংসাবশেষ তারই নিদর্শন।

গোবরহাটি ঃ বহরমপুর থেকে কর্ণসুবর্ণ (রাঙামাটি চাঁদপাড়া) হয়ে ১৬ কিলোমিটার দ(ি ণ-পশ্চিমে অথবা গোকর্ণ থেকে গোকর্ণ চাঁদপাড়া সড়কে প্রায় চার কিলোমিটার দ(ি ণ-পূর্বে এক কালের বর্ধিষু(গ্রাম গোবরহাটি। কান্দী থানায় অবস্থিত এই গ্রামটি কারও কারও মতে কর্ণসুবর্ণের সমকালীন। যাই হোক গ্রামটি যে এককালে বেশ কিছু বিত্তবান ব্যক্তি(র বাসস্থান ছিল তা বোঝা যায় গ্রামের উত্তর-পূর্বে ও উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত দুটি বিশাল দীঘি, অনেকগুলি মন্দির, পুরোনো কয়েকটি বাড়ীর অবস্থান থেকে। তবে গ্রামের শ্রেষ্ঠ সম্পদ দর্শনীয় বিশাল পঞ্চরত্ন মন্দিরটি।

গ্রামের প্রায় মাঝামাঝি অবস্থিত এই পঞ্চরত্ন মন্দির স্থাপত্যের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এত বড় এত উঁচু পঞ্চরত্ন মন্দির মুর্শিদাবাদ জেলায় আর নাই। বর্গাকার মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৮ মিটার, উচ্চতায় প্রায় ১২ মিটার। মন্দিরের সুউচ্চ মূল চূড়া ও চার দিকের চারটি (ুদ্রতর চূড়ার স্থাপত্য বহুকার্ণিশযুক্ত(দেউলরীতির। বাঁকানো কার্ণিশযুক্ত(এই পঞ্চরত্ন মন্দিরের পোড়ামাটির ভাস্কর্য উচ্চ শ্রেণীর। তিনটি খিলানযুক্ত(সম্মুখ ভাগে পোড়ামাটির ফুল-লতা-পাতার অলঙ্করণ।

মন্দিরের বিগ্রহ কষ্টিপাথরের মদনমোহন এবং অষ্টধাতুর শ্রীরাধা। তবে রাধিকামূর্তি অপহৃত হওয়ায় এখন সেখানে শ্রী-রাধার মৃণ্ময়ী

মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। মন্দির স্থাপন করেন তৎকালীন নবাব-সরকারের কর্মচারী ব্রজমোহন দাস (ঘোষ), নির্মাণকাল ১৭৭১-৭২ খৃষ্টাব্দ। মন্দিরটি সম্প্রতি সংস্কৃত হয়েছে এবং সুখের বিষয় সংস্কারের ফলে মন্দিরের পূর্বরূপের কোন পরিবর্তন হয়নি।

চক্ ইসলামপুর ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার সদরশহর বহরমপুর থেকে প্রায় ছাব্বিশ কিলোমিটার পূর্বে পদ্মার শাখানদী ভৈরবের তীরে প্রায় তিনশো বছর আগে গড়ে উঠেছিল চক্-ইসলামপুর যমজ গ্রাম। ইসলামপুরে ভৈরব নদীর উপর কলাডাঙ্গা ঘাটের ব্রীজ থেকে পূর্বমুখী রাস্তা সামান্য কিছুদূর যাওয়ার পর দু'ভাগ হয়ে এক ভাগ উত্তরদিকে বাঁক নিয়ে ইসলামপুরের পাশ দিয়ে চলে গেছে পদ্মাতীরের শেখপাড়ার দিকে। আরেকটি ভাগ আগের মত পূর্বদিকে সোজা গেছে ডোমকল জলঙ্গীর দিকে। দু'পাশে দুটি গ্রাম।

একসময় ইসলাম খান্ নামে বাংলার এক সুবাদার এ পথে সেনা-অভিযান করার সময় তাঁর নাম অনুসারে ইসলামপুর গ্রামের নামকরণ করেন।

ইসলামপুর গ্রামের পাশে ভৈরবের চরে ডোমকল কুঠীর নীলকর সাহেবরা নীলের চাষ করত। তখন তার নাম ছিল সাহেবচর। এই চরেই চক্ গামের পত্তন। ফার্সীতে চক্ শব্দের অর্থ বাজার। এই গ্রামটি যে প্রথম থেকেই বাজার এলাকা ছিল তা নাম থেকেই বোঝা যায়। চক্ বিশেষভাবে রেশমশিল্পীদের বাসস্থান।

পু(যানুত্র(মে রেশমশিল্প এই গ্রামের লোকেদের প্রধান উপজীবিকা। নবাব আলীবর্দীর শাসনকালে কাশিমবাজারে তাঁতীদের অনেকেই দূরের ভৈরবের পারে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেয়। ফলে চক্গ্রামে রেশমশিল্প ব্যবসার খুব উন্নতি ঘটে। রেশম শিল্পে বড় বড় মহাজন তৈরী হয়। ভৈরবের তীর বরাবর ডাঙ্গাপাড়া পাহাড়পুর, চাতরা, রামকৃষ(পুর প্রভৃতি গ্রাম ছিল নদী-বন্দর কাশিমবাজারের পশ্চাদ্ভূমি স্বরূপ। এখানকার রেশম কাটুনি তাঁতীরা কাশিমবাজারের মহাজনদের কিংবা রেশমকুঠীর মালিকদের কাছে, তাদের তৈরী কাঁচারেশম ও রেশমীবস্ত্র দিয়ে আসত।

বর্গীর হাঙ্গামায় কাশিমবাজারে স্বাভাবিক ব্যবসা ব্যহত হলেও একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। বিভিন্ন গ্রাম-গঞ্জের লোকেরা যারা দূর গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিল তারা পরবর্তীকালে কাশিমবাজারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। পরে কাশিমবাজারের ভেতর দিয়ে গঙ্গার প্রবাহ পথ (দ্ধ হয়ে গেলে কাশিমবাজারের পতন ঘটে (১৮১৩)। তখন এই সব অঞ্চলের রেশমশিল্পী ও তাঁতীরা সৈদাবাদ ও খাগড়ার রেশম মহাজনদের কাছে রেশম ও রেশমী কাপড় বিত্রি(করত। কাতলামারী, ডোমকল ও শিকারপুর (নদীয়া) প্রভৃতি স্থানে ছিল সাহেবদের রেশমকুঠী, পরে তা নীলকুঠীতে রূপান্তরিত হয়। কৃত্রিম নীল উদ্ভাবনের ফলে নীলকুঠীতে নীল উৎপাদন বন্ধ হলে এই সমস্ত কুঠিয়াল একত্র হয়ে মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানী লিমিটেড তৈরী করেন এবং এরা অন্যান্য জমিদারদের মত জমিদারী কাজ করতে থাকেন। ইসলামপুরের তিন কিলোমিটার উত্তরপূর্বে গোয়াস গ্রামটি একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। বৈষ(ব ধর্মের কেন্দ্র গোয়াস। বৈষ(ব কবি রামচন্দ্র কবিরাজ ও গোবিন্দ দাস কবিরাজের ভাগিনেয় বলরাম দাস নিজেও একজন বৈষ(ব পদকর্তা এবং এই স্থানের বাসিন্দা। ঘোড়ার ডাকের প্রচলনের সময় ইসলামপুরের কলাডাঙ্গা ঘাটের ডাক হরকরাদের ঘোড়া বদলানোর কেন্দ্র ছিল, ইসলামপুর গ্রামের জমিদার বংশের নামডাক ছিল বহুদিন থেকে। এই বংশের আদি পু(ষ হরিকৃষ(মজুমদার এবং তাঁর ভ্রাতা প্রিয়কৃষ(মজুমদার প্রমুখ ছিলেন কৃতী ও বিদ্যোৎসাহী। তাঁদের চেষ্টাতেই ইসলামপুরে উচ্চবিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। জেলার প্রাচীন বিদ্যালয়গুলির মধ্যে এটি অন্যতম। প্রিয়কৃষ(মজুমদার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র ব্যানার্জীর (ডব্লিউ. সি. বনার্জীর) জামাতা ছিলেন। পাশ্চাত্যসুলভ চালচলনের জন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে তিনি 'সাহেববাবু' নামে খ্যাত ছিলেন। ১৯৪০ সালে দ্বিতীয় মহাসমরের সময় ভারতীয় বিমান বাহিনীর পত্তন হলে তাঁর দুই পুত্র বিমান বাহিনীতে যোগদান করেন এবং দ্বিতীয় বি(েযুদ্ধের সময় তারা দুজনেই মারা যান।

ইসলামপুরের বাইশ পুতুল পুজা এবং চকের বুড়িমা তলায় বুড়িমা (দেবীদুর্গা) পূজা এবং কালীতলার কালীমাতা দেবী ঠাকুরানীর পূজা ঐতিহ্যসম্পন্ন। ইসলামপুরে একটি বহু পুরোনো জীর্ণ মসজিদও আছে।

প্রাক্ স্বাধীনতাপর্বে এই যমজ গ্রাম দুটির যে অবস্থা ছিল এখন তার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। চক্ গ্রামের রেশমশিল্পের জন্য সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠেছে ছোট বড় প্রায় পঞ্চাশটি কেন্দ্রীয় খাদি ও গ্রামদ্যোগ কমিশন এবং রাজ্য খাদি পর্ষৎ অনুমোদিত বিধিবদ্ধ সংস্থা ও সমবায় সমিতি। চক্ গ্রামকে কেন্দ্র করে ডোমকল ইসলামপুর থানা, মুর্শিদাবাদ জিয়াগঞ্জ ব্লক এবং অন্যান্য স্থানের শিল্পী ও কাটুনীরা এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত(। এই গ্রাম থেকে সরবরাহ করা রেশমী বস্ত্র ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের চাহিদা মেটায়। চক্-ইসলামপুর আজ একটি উন্নত ব্যবসাপ্রধান স্থান। চক্-ইসলামপুরে একাধিক ব্যাঙ্ক, পোষ্ট অফিস, কলেজ, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বালিকাদের জন্য উচ্চবিদ্যালয়ও আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনস্বাস্থ্য কারিগরী বিভাগ বিশুদ্ধ পানীয়

জল সরবরাহের ব্যবস্থা করেছে। বিদ্যুতের সুবিধাও গ্রামবাসীরা ভোগ করে থাকে এবং টেলিফোনের ব্যবস্থাও বাদ নেই।

ব্রিটিশ আমলে ভৈরব নদী যখন বহস্ত ছিল, তখন নদীতে প্রচুর জল থাকত, কলকাতা থেকে কলাডাঙ্গা ঘাট পর্যন্ত বছরের প্রায় আটমাস হর্মিলা কোম্পানীর স্টীমার চলত। এখন নদীর নাব্যতা না থাকায় নদীপথে ব্যবসা বানিজ্য হয় না, কিন্তু স্থলপথে পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটায় বহুগ্রাম ও বহুপথের সংযোগস্থল এই চক্ ইসলামপুর দ্রুত উন্নত হচ্ছে শি(া-দী(ায় ও ব্যবসা-বাণিজ্যে। প্রসিদ্ধ রেশম ব্যবসায়ী হিসাবে চক্ গ্রামের জমিদার বটকৃষ(রানো ও পুলিন চন্দ্র রানো, প্রতাপ চন্দ্র সাহা, মহেশ চন্দ্র গুঁই প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। চক্ গ্রামের চন্দ্রকান্ত ললিত মোহন রেশম খাদি সমিতি আজ সারা ভারতে খাদি শিল্পের (ে ত্রে একটি পরিচিত নাম। আজ থেকে প্রায় ৭৫ বছর পূর্বে ১৯২৪ সালে গান্ধিজী অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সহযোগী হিসাবে চরকা আন্দোলনের প্রবর্তন করেন এবং অখিল ভারত চরকা সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় চক্ গ্রামের রেশম ব্যবসায়ী ললিত মোহন সাহা ও তাঁর সুযোগ্য জামাতা কালীপদ চৌধুরী, রনজিৎ কুমার বি(াস ও তাঁর ভ্রাতৃবর্গের প্রচেষ্টায় চরকা আন্দোলন আরম্ভ হয়। সেই হিসাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে চক্ ইসলামপুর গ্রামের ভূমিকা কম নয়।

চরকা ঃ রঘুনাথগঞ্জ শহরের 'ফুলতলার মোড়' থেকে কাঁচা রাস্তায় দেড় কিলোমিটার দ(ণ পূর্বে, ভাগীরথীর তীরে, ঐতিহাসিক গ্রাম চরকা, অবস্থিত। বাংলার সুবাদার থাকা কালে শাহ্ সুজা এখানে এসেছিলেন। আলীবর্দী খাঁ মুর্শিদাবাদ আত্র(মণের সময় (এপ্রিল, ১৭৪০) চরকা, বালিঘাটা ও সুতিতে সরফরাজ খাঁর বি(দ্ধে সৈন্যসমাবেশ করেন। গ্রামের দ(ণ অংশে রেজ্জাক বা রাজ্জাক শাহ্ পীরের মজার ও জামাল শাহের সমাধি। নানা গাছের ছায়াঘেরা অতি মনোরম স্থানটিতে মোট ২১টি সমাধি আছে। একটি অনাচ্ছাদিত উঁচু চত্বরের উপর কবরগুলি অবস্থিত। রেজ্জাক শাহের কবরটিই সর্বাপে(া যত্নে র(িত। তিনি মুসলমান শাসনের প্রথম দিকে (সম্ভবত তের-চোদ্দ শতকে) ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এখানে এসেছিলেন। মধ্য - এশিয়ার লোক বলে কথিত এই পীরকে হিন্দু - মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই এখনও যথেষ্ট ভক্তি(শ্রদ্ধা করেন। জামাল শাহ্ রেজ্জাক শাহের শিষ্য। তাঁর আর দুই শিষ্য ও সেবক মসলেম শাহ্ ও নিয়েত হোসেনও এখানে শায়িত। মহরমের সময় বহু ব্যক্তি(তাজিয়া ইত্যাদি সহ শোভাযাত্রা করে এখানে এসে সমবেত হন। ফতেহা-দোয়াজ-দাহাম উপল(্যে এখানে বড় উৎসব হয়। সমাধি(ত্রটি জেলায় এ জাতীয় পুরাকীর্তির মধ্যে সব চেয়ে সর্যত্নর(িত।

চন্দনবাটি ঃ বহরমপুর থেকে প্রায় ২৫ কিমি উত্তর-পশ্চিমে অথবা সাগরদীঘি রেল স্টেশন থেকে প্রায় ৩ কিমি দ(ণ-পূর্বে গ্রাম ও শিবমন্দির। চন্দনবাটি এলাকা বা পূর্বের মৃত্যুঞ্জয়পুর এককালে পাল ও সেন রাজাদের অধীন ছিল। বাংলা ১৩৩৪ সালে নির্মল কুমার সিংহ (নওলা(া) গ্রামের উঁচু ঢিবিটি কাটতে বলেন। এই জায়গাটি জিয়াগঞ্জের নেহালিয়ার সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ এর এস্টেটের অন্তর্ভুক্ত(ছিল। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে খননকার্য শেষ হলে অন্যান্য অনেক মূল্যবান জিনিসের সঙ্গে এক বিরাটাকার শিবলিঙ্গ ১০-১২ ফুট মাটির নিচ থেকে তোলা হয়। শিবলিঙ্গের মোট উচ্চতা ৪ ফুট। গৌরী পাটের উপর থেকে শিবলিঙ্গের উচ্চতা ১ ফুট ৪$^{১}/_{২}$ ইঞ্চি। শিবলিঙ্গের বেড় ৪ ফুট ৮ ইঞ্চি। গৌরীপাট প্রস্থে ৪ ফুট ৮ ইঞ্চি। দৈর্ঘ্য সাড়ে ৬ ফুট। মাটির নিচে পুরোনো মন্দিরের ভিত দেখা যায়। স্থানীয় ব্যবসায়ী (বর্তমানে কান্দী নিবাসী) কালুরাম রামচাঁদ রঘুনাথ সাদানী ১৩৬০ বঙ্গাব্দে শিবমন্দির সংলগ্ন ১০ বিঘা জায়গা নিয়ে সাধারণভাবে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করে সেবাইত হিসাবে র(ণাবে(ণের দায়িত্ব নেন। এখন স্থানীয় ট্রাস্টির হাতে শিব মন্দিরের জমি ও পূজার দেখাশোনার দায়িত্ব।

চুনাখালি ঃ বর্তমান মুর্শিদাবাদ শহরের প্রায় চার-পাঁচ মাইল দ(ণ-পূর্বে অবস্থিত অধুনা হৃতগৌরব চুনাখালি একসময়ে মুর্শিদাবাদ নগরীর অন্তর্গত একটি প্রাচীন গৌরবময় ও সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। বাংলায় মুসলমান রাজত্বের আগে থেকেই সম্ভবত অন্য নামে এর পরিচিতি ছিল। আকবরের রাজত্বকালের রাজস্ব বিভাগের একটি গু(ত্বপূর্ণ পরগণা চুনাখালি। তখন বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ এই পরগনার অন্তর্ভুক্ত(ছিল। হান্টার সাহেবের 'এ স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাকাউন্টস অব্ বেঙ্গল' নবম খন্ড অনুসারে এই পরগণার আয়তন ৮০.০২ বর্গমাইল। ৫৫০টি মৌজা ও ১৯৪টি জমিদারী এর অন্তর্গত এবং সরকারী কোষাগারে দেয় রাজস্ব ছিল ৩১০৯ পাউন্ড ১০ শিলিং। আইন-ই-আকবরীতেও এই পরগণার উল্লেখ রয়েছে।

এক সময়ের মুর্শিদাবাদের জেলা জজ এইচ বিভারিজ তাঁর 'ওল্ড পে-সেস ইন্ মুর্শিদাবাদ' (ক্যালকাটা রিভিউ ১৮৯২) নামক প্রবন্ধে তৎকালীন চুনাখালিকে একটি অসামরিক প্রশাসন কেন্দ্ররূপে উল্লেখ করেছেন। এখানে তিনি বহু অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দেখেছেন। তৎকালীন চুনাখালির সমাহর্তাকে (Collector) লেখা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রেসিডেন্ট মিড্লটন সাহেবের একটি চিঠির উল্লেখ করে

বিভারিজ জানিয়েছেন যে, চুনাখালির উত্তরপ্রান্তে নিশাদবাগ পর্যন্ত প্রশস্ত রাজপথ দু'পাশে ঋজু ঘন সুদৃশ্য দেবদা(গাছে শোভিত ছিল। প্রসঙ্গত তিনি বহরমপুরের মেহগিনি এবং কারবালার দেবদা(বীথিকার চেয়েও এর সৌন্দর্যকে 'মহত্তম' (Noblest) বলেছেন। দেবদা(র মতই এখানকার বটবৃ(এবং সর্বোপরি আম্রকাননের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন তিনি।

বর্তমানে কাশিমবাজার নিমতলা অঞ্চলটি চুনাখালি নামে পরিচিত। কাটিগঙ্গা যেখানে দ(ি ণ-পশ্চিমদিকে বাঁক নিয়েছে সেখান থেকে প্রায় ১ কিমি উত্তর-পূর্বে এর অবস্থান। কিন্তু বহু পূর্বে চুনাখালি ছিল ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে। আনুমানিক পঞ্চদশ শতকের শেষে বা ষোড়শ শতকের প্রথমে গঙ্গার গতি পরিবর্তিত হয়ে কাটিগঙ্গার খাতে প্রবাহিত হয়। যে সময় কাশিমবাজারের স্বর্ণযুগ ছিল তখন চুনাখালির গৌরবও কম ছিলনা। পাঠান আমলে এর বিশেষ প্রসিদ্ধি ঘটে। সুতরাং মুর্শিদাবাদ শহরের আগেই চুনাখালির আবির্ভাব ঘটেছে। একসময় এখানে কাগজ তৈরীর বহু কারখানা ছিল।

মুর্শিদকুলি খাঁ যখন দেওয়ান ছিলেন তখন এখানে বৃন্দাবন রায় নামে এক জমিদার ছিলেন। এক ফকিরের সঙ্গে তাঁর বিবাদ এবং তৎকালীন কাজী মহম্মদ সরাফের বিচারে তাঁর প্রাণদন্ডের একটি ঘটনার বিবরণ 'মুর্শিদাবাদের ইতিহাস' (নিখিলনাথ রায়) এবং 'মসনদ অব্ মুর্শিদাবাদ' (পূর্ণচন্দ্র মজুমদার) গ্রন্থে উল্লিখিত আছে।

বর্তমান চুনাখালি অতীতের কঙ্কাল মাত্র। এখন দ্রষ্টব্য বলতে গ্রামের উত্তরদিকে একটি প্রাচীন দরগা ও দুটি প্রাচীন জীর্ণ মসজিদ অবশিষ্ট আছে। দরগাটি পীর মসনদ আউলিয়া নামে জনৈক ফকিরের। আউলিয়ার সমাধির উপর নির্মিত গৃহটি সাম্প্রতিককালের। সম্ভবত মূল সমাধিগৃহটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে সেখানে অনেকদিন পর গৃহটি পুনঃ নির্মিত হয়েছে। আদৌ সেখানে সমাধিগৃহটি ছিল কিনা, বলা কঠিন। সমাধিগৃহের পূর্বে দেওয়ালের বাইরের দিকে একটি তুঘরা লিপিতে খোদিত প্রস্তর ফলক এবং দ(ি ণের দেওয়ালের বাইরের দিকে একটি আরবী অ(রের খোদাই করা প্রাচীন শিলালিপি আছে। কোন লিপিই অবশ্য এই সমাধি ঘরের নয়, অন্য কোন মসজিদের। প্রথম লিপি অনুসারে গৌড়ের সুলতান আবুল মজফফর ফিরোজ শাহ্-এর রাজত্বকালে ৮৯৬ হিজরিতে মহরম মাসের দ্বিতীয় দিনে (রবিবার ১৫ নভেম্বর ১৪৯০ খ্রীঃ) মসজিদটি নির্মিত হয়। ঐ মসজিদের কোনো চিহ্(এখানে নেই। প্রস্তর খন্ডটি অনেকদিন পরিত্যক্ত(অবস্থায় ছিল। নতুন গৃহে তা প্রোথিত হয়েছে মাত্র। তুঘরা লিপি খচিত এই ফলকটি সম্ভবত চুনাখালির মাইল তিনেক দ(ি ণ-পশ্চিমে বহরমপুর সংলগ্ন কারবালায় অবস্থিত একটি পাঠান আমলের মসজিদের প্রতিষ্ঠা লিপি।

দ্বিতীয় লিপিটিতে মহম্মদ ইবন-উল্-হুদাত মূলতানী নামক জনৈক ব্যক্তি(র নাম উল্লিখিত এবং তারিখ রয়েছে ১১৫৩ হিজরির রবিউল আওয়াল মাস (নভেম্বর - ডিসেম্বর ১৭৪২ খ্রীঃ)। এই ইবন-উল্-হুদাদ বৃন্দাবন রায় সম্পর্কিত কাহিনীর ফকির হলেও হতে পারেন। অবশ্য এ বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। যে মসজিদ থেকে এটি এখানে পরিত্যক্ত(হয়ে এসেছে, তাও বর্তমানে অবলুপ্ত।

দরগার দ(ি ণে একটি বড় ও গভীর প্রাচীন ইঁদারা আছে। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে ইঁদারার জল স্পর্শ করা যায়। দরগার পূর্ব-দ(ি ণ সীমানায় কয়েকটি কবর আছে। গৃহের খানিকটা উত্তর-পূর্বে পীর মখদুম সাহেবের সমাধি আছে। এঁর পরিচয়ও অজ্ঞাত। এই সমাধির উপর কোন গৃহ বা আচ্ছাদন নেই।

দরগার পশ্চিমে রয়েছে মোগল আমলে নির্মিত একটি জরাজীর্ণ (দ্র তিন গম্বুজ বিশিষ্ট পরিত্যক্ত(মসজিদ। মসজিদের প্রবেশপথের উপর আরবী অ(রে উৎকীর্ণ একটি প্রতিষ্ঠালিপি আছে। পীর সাহেবের দরগার উত্তর-পূর্বের রাস্তার পূর্বদিকে আরও একটি পরিত্যক্ত(তিন গম্বুজ যুক্ত(মসজিদ। এই মসজিদের স্থাপত্য আকর্ষণীয় এবং কিছুটা পঙ্খের (চুনবালির) কাজ আছে। এরও প্রবেশদ্বারের উপর একটি আরবী ভাষার প্রতিষ্ঠা লিপি আছে। লিপি অনুসারে মসজিদটি ১১৮৮ হিজরি অর্থাৎ ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। এই মসজিদের অবস্থা অতি শোচনীয়।

মসজিদের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটি মুর্শিদাবাদ নিশাদ বাগের একদা খ্যাত 'দেবদা(বীথিকা'য় মিশেছে তার পশ্চিমে রয়েছে একটি বড় আকারের মজা দীঘি এবং তার পাড়ে কয়েকটি ছোট-বড় ঢিবি। এই স্থানটিই যে ছিল একসময়ের ঘনবসতিপূর্ণ চুনাখালির কেন্দ্রভূমি তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এখন এখানে কোন ঘরবাড়ির অস্তিত্ব নেই বটে, তবে জড়ো হয়ে থাকা ইঁট পাটকেলের প্রাচুর্য দেখেই এর প্রাচীন নাগরিক সমৃদ্ধির কথা অনুমান করা যায়।

যাই হোক, বিভারিজ বর্ণিত সেই সমৃদ্ধ জনপদ আজ ধ্বংস স্তূপে পরিণত। সেই আম্রকানন নেই, নেই সেই 'দেবদা(বীথিকা'। মহাযুদ্ধের করাল গ্রাসে ও মানুষের লোভে আত্মাহুতি দিয়ে সে আজ সম্পূর্ণ মৃত।

চোঁয়া ঃ হরিহরপাড়ার ৩ কিলোমিটার দ(ি ণ পূর্বে, বড় ভৈরব নদের পশ্চিম তীরে, এক কালের অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী এ- গ্রামের পূর্ব নাম চন্দ্রদ্বীপ। এখানকার রায়চৌধুরী ও সর্বাধিকারী বংশীয় জমিদারগণ প্রভূত খ্যাতি ও বিত্তের অধিকারী ছিলেন। মাধবরাম রায়চৌধুরী ছিলেন

সুজা-উদ্-দৌল্লার সময়ে নবাব সরকার উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তিনি স্বগ্রামে কয়েকটি শিবমন্দির ও অন্যান্য দেবালয় স্থাপন করেন। জমিদারদের পরিত্যক্ত(সব বিশাল অট্টালিকা ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান। স্থানীয় এক নীলকুঠীর বাড়িতে এখন হরিহরপাড়া থানার কার্যালয় অবস্থিত।

জজান ঃ বৌদ্ধ ধর্মের মহাযানপন্থী উপাসনায় এই গ্রামটি একদা সমৃদ্ধ ছিল। উত্তরপ্রদেশ থেকে আগত পাঁচজন কায়স্থের অন্যতম সোম ঘোষের সময় থেকে জজান ঐতিহাসিক গ্রাম হিসেবে পরিগণিত হয়। তৎপূর্বে জজানে বৌদ্ধ মহাযানপন্থীদের প্রভাব ছিল বেশী। জজান নামটির উৎপত্তি হয়েছে 'জয়যান' থেকে। এই থেকে বোঝা যায় এই গ্রামটির সঙ্গে বৌদ্ধ সংস্কৃতির একদা সম্পর্ক ছিল।

জজানে ইতিহাসগত উপাদানকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছে-সোমেশ্বের নামাঙ্কিত শিবের একটি সুউচ্চ মন্দির। জজান জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা সোমেশ্বের ঘোষের উদ্যোগে দেউলরীতির সুউচ্চ এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই গ্রামেরই বিখ্যাত সর্ব্বমঙ্গলা মন্দিরের দ(ণ-পশ্চিমদিকে এই মন্দির। মন্দিরের গর্ভগৃহটি যথেষ্ট গভীর। ৬টি সোপান পেরিয়ে শিবলিঙ্গের মূর্তি সমীপে পৌঁছানো যায়। প্রোথিত শিবলিঙ্গের যথেষ্ট গভীরে আছে সুদীর্ঘ সূড়ঙ্গ। এই সুড়ঙ্গ চতুর্দিকে চারটি গুহায় বিভক্ত(হয়েছে। উক্ত(গুহা চতুষ্টয় থেকে চারটি গুহাপথ চারদিকে চারটি পুকুরে গিয়ে শেষ হয়েছে। রাণীভবানীর সময়ে (বাংলা ১১৭২ সন) তাঁর উদ্যোগে সোমেশ্বের মন্দির একবার সংস্কৃত হয়।

জজান গ্রামটির সর্ব্বমঙ্গলা মন্দিরের খ্যাতি সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলাতে শোনা যায়। সর্ব্বমঙ্গলা দেবী কালী মূর্তি হিসেবে পূজিত। বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সন্ন্যাসী কালিকানন্দ অবধূত জজান গ্রামে বাস করেছিলেন। তিনি ছিলেন কালীসাধক এবং সর্ব্বমঙ্গলার নিত্য পূজারী। সর্ব্বমঙ্গলা মন্দিরের বর্তমান প্রতিমা খানিকে তিনি দুটি পঙ্খের (সিমেন্ট নির্মিত) উপর সংস্থাপিত করেন।

জজান গ্রামে একটি ঐতিহাসিক পরিখাও ল(্য করা যায়। বর্তমানে যা অপরাজিল খাল হিসেবে খ্যাত। বল্লাল সেনের (১১৫৮-৭৯ খ্রীঃ) নৈহাটি বা সীতাহাটি তাম্রশাসনে অপরাজিল খালটির পরিচয় পরিখা হিসেবে উল্লিখিত রয়েছে।

জঙ্গীপুর ঃ ব্যাণ্ডেল-বারহাড়োয়া লুপ-লাইনের জঙ্গীপুর রোড স্টেশনের ২ কিলোমিটার পূর্বে জঙ্গীপুর শহরটি ভাগীরথীর পূর্ব ও পশ্চিম দুই পাড়েই অবস্থিত। পূর্বে জঙ্গীপুর ও পশ্চিম পাড়ে রঘুনাথগঞ্জ। জঙ্গীপুর অংশটি প্রাচীনতর। এই জনপদের সাবেক নাম জাহাঙ্গীরপুর। শহরের সদরঘাটের কাছে বাবুবাজারে অবস্থিত, বাঁকানো কার্ণিসযুক্ত(ও আটকোণা উল্টানো পদ্মের আকারের চূড়াসমন্বিত, ঊনিশ শতকের দুটি ছোট শিবমন্দির আছে। স্থাপত্য অতি সাধারণ। উত্তর দিকেরটির নির্মাণকাল ১২৪৪ বঙ্গাব্দ (১৮৩৭) খ্রীঃ)। অদূরে রঘুনাথের দোতলা দালান মন্দিরটি রাণী ভবানীর কর্মচারী রায় খোশাল সিংহ ১২০১ বঙ্গাব্দে (১৭৯৪খ্রীঃ) নির্মাণ করেন। সেটির সম্মুখে টিনের ছাদযুক্ত(নাটমন্দির আছে। দ(ণ দিকে দুটি করে চারটি আটকোণা চূড়াসমন্বিত শিবমন্দির আছে। দ(ণের মন্দির দুটিতে ফুল ও লতাপাতার কা(কার্য দেখা যায়। মূল মন্দিরে রাম,সীতা ও লক্ষ্মণের বিগ্রহের নিয়মিত পূজা হয়। একই পল্লীতে বৃন্দাবনবিহারীর বিশাল দালান মন্দিরটির স্থাপত্য আঠার-উনিশ শতকের ইউরোপীয় প্রাসাদের অনুরূপ। প্রতিষ্ঠাতা জঙ্গীপুরের বিখ্যাত ধনকুবের দেওয়ান কীর্তিচন্দ্র। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নুরপুর কুঠীর দেওয়ান হিসাবে তিনি প্রভূত বিত্ত অর্জন করেন। মূল মন্দির, নাটমন্দির, ভোগমন্দির ও অতিথিশালা বিস্তৃত স্থান জুড়ে অবস্থিত । প্রবেশপথের উত্তর দিকে প্রায় ৮ মিটার উচ্চতার উল্টানো পদ্মাকৃতি ছাদবিশিষ্ট একটি আটকোনা শিবমন্দির আছে। খিলান শীর্ষের কুলুঙ্গিতে পোড়ামাটির বিভিন্ন দেবমূর্তির দু'একটি এখনও দেখা যায়। মন্দির দু'টির নির্মাণকাল ১১৭০ বঙ্গাব্দ (১৭৬৩ খ্রীঃ।)

বৃন্দাবনবিহারী মন্দিরের কিছুটা উত্তরে, ভাগীরথীর পুরাতন খাতের তীরে, বাগিচাবাড়ি বা গোবর্ধনযাত্রা-প্রাঙ্গণের পশ্চিম প্রান্তে, রঘুনাথজীর তিনতলা বিশাল মন্দিরে ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। চার কোনে চারটি আটকোণা, বাঁকানো কার্ণিসযুক্ত(ও উল্টানো পদ্মাকৃতি ছাদবিশিষ্ট শিবমন্দির আছে। প্রায় ৯ মিটার উচ্চতার এ- দেবালয়গুলিকে বড়নগরের ভবানীশ্বের মন্দিরের (দ্রতর সংস্করণ বলা যায়।

সদরঘাটের কাছে, মহাবীর মন্দিরের বাইরে, একটি (োদিত প্রস্তরস্তম্ভের অংশ প্রোথিত আছে। বৃন্দাবনবিহারী মন্দিরের প্রবেশপথের কাছেও অনুরূপ আর একটি স্তম্ভ দেখা যায়। এ দুটি প্রায় চল্লিশ বছর আগে গণকরের এক মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল।

সদরঘাটের প্রায় আধ কিলোমিটার দ(ণ পূর্বে বিন্দুবাসিনীর 'থানে' অষ্টভুজা সিংহবাহিনীর মর্মরমূর্তি স্থাপিত। অন্যত্র প্রাপ্ত এ - মূর্তিটি পরে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেবীর মাথার মুকুট, দুই হাতে ধৃত শূল পদতলে পিষ্ট মহিষাসুরের বুকে বিদ্ধ। সিংহের কেবল মুখটিই আছে। প্রায় ১ মিটার উঁচু এই মূর্তিটির নির্মাণকাল সম্ভবতঃ দু'শ বছরের বেশী নয়।

জিয়াগঞ্জ ঃ জিয়াগঞ্জের প্রাচীন নাম ছিল 'গম্ভীলা'। এখানে একটি পাড়ার নাম বালুচর। এই বালুচর নাম থেকেই এ অঞ্চলে তৈরি

অতিসূক্ষ্ম কাজের রেশমী শাড়ির নাম হয়েছে বালুচরী। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বালুচরের উল্লেখ পাওয়া যায়। মুর্শিদকুলি খাঁ ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে রাজধানী উঠিয়ে আনার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধার জন্য রাজস্থানের বিকানীর থেকে এসে ধনী জৈনরা এখানে বসতি স্থাপন করেন এবং জিয়াগঞ্জ নবাবী আমলে প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে। ভাগীরথীর এপার-ওপার আজিমগঞ্জ ও জিয়াগঞ্জ দুটি যমজ শহরতুল্য। দুগার, সিংহী প্রভৃতি উপাধিধারী জৈনরা এখানে বাস করেন। বর্তমানে তাঁদের অনেকেই বাইরে থাকেন। এখানে তিনটি দর্শনীয় জৈন মন্দির একই রাস্তার ওপর কাছাকাছি অবস্থিত। প্রথমটি বিশাল আকৃতির আদিনাথ মন্দির। দ্বিতীয়টি বিমলনাথজীর মন্দির, তাতে পাথরের তৈরী অনেকগুলি চূড়া। লক্ষ্মীপৎ সিং দুগর ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এই মন্দির তৈরী করেন। তৃতীয়টি সম্ভবনাথের মন্দির, এরও বহু চূড়া। এখানে একটি বিশাল জৈন ধর্মশালা আছে। জিয়াগঞ্জ জৈন সম্প্রদায়ের তীর্থস্থান। মহাবীর জয়ন্তী জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হয়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এখানকার জৈনদের দানে এখানে শ্রীপৎ সিং কলেজ ও রাণী ধন্যাকুমারী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শহরের নেহালিয়া অঞ্চলে রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহের প্রতিষ্ঠিত পুরাকীর্তি সংগ্রহশালাটি এখনো জনসাধারণের জন্য খোলা হয়নি। জিয়াগঞ্জ বৈষ(ব সম্প্রদায়েরও তীর্থস্থান। মণিপুরের বৈষ(বগণও এখানে তীর্থ দর্শনে আসেন। দুটি বৈষ(ব মন্দির আছে এখানে - বড় গোবিন্দবাড়ী ও ছোট গোবিন্দবাড়ী।

জিয়াগঞ্জের অদূরে ভাগীরথীর পূর্বতীরে সাধকবাগ আখড়া ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে মহান্ত মস্তরাম আউলিয়ার প্রতিষ্ঠিত। মোগল সম্রাট মস্তরামকে অনেক ভূসম্পত্তি দান করেন। পরবর্তীকালে নবাবরাও ভূসম্পত্তি দেন। তার আয় থেকে আখড়া চলে। আখড়ার বহু জমি জায়গা বর্তমানে বাংলাদেশে পড়ে গেছে। তাই আয় এখন সীমিত। নতুন মহান্তর অভিষেকের সময়ে মুর্শিদাবাদ থেকে নবাব নাজিম এসে কপালে টিকা পরিয়ে দিতেন। মহান্ত মস্তরামের অলৌকিক শক্তি(র পরিচয় পেয়ে মুর্শিদকুলি খাঁ তাঁকে আউলিয়া সিদ্ধ পু(ষ উপাধি দেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় কেবল এই সাধকবাগ মঠেই সাধু সন্ন্যাসীদের অস্ত্রশি(া দেওয়া হ'ত। এখানে প্রায় পাঁচশ বলিষ্ঠ অস্ত্রধারী সন্ন্যাসী থাকতেন। মস্তরাম আউলিয়া রাণী ভবানীর বালবিধবা কন্যা তারাকে সিরাজের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আখড়ায় এনে পাহারা দিয়ে রাখেন। পুরানো আখড়া বন্যায় সম্পূর্ণ নষ্ট হওয়ায় ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে নতুন আখড়া তৈরি হয়। এখানে বিভিন্ন প্রকারের ও বিভিন্ন উপাদান তৈরি বিষু(ও দশাবতারের প্রায় পাঁচশ মূর্তি ও এক হাজার শালগ্রাম শিলা রাখা আছে। মূর্তিগুলি ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে জোগাড় করা হয়েছে। বর্তমান মন্দিরের চারদিকে প্রশস্ত বারান্দা ও চারটি প্রবেশদ্বার আছে। উত্তর ও দ(িণের প্রবেশদ্বারের দুদিকের দেওয়ালে পাল-সেন আমলের বিষু(, নারায়ণ, সূর্য, হনুমান প্রভৃতি কয়েকটি সুন্দর পাথরের মূর্তি গাঁথা আছে। মন্দিরের ভেতরেও থামের গায়ে বসান আছে একটি চমৎকার ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি ও আরও কয়েকটি মূর্তি। এই আখড়ায় মস্তরামের সংগৃহীত একটি পাথরের খন্ডও দর্শনীয় বস্তু। রথযাত্রায় এখান থেকে পিতলের রথ রেরোয়। অন্যান্য উৎসবাদি যথারীতি পালিত হয়।

ডোমকল ঃ বহরমপুর শহর থেকে ৩৫ কিমি পূর্বে ডোমকল জেলার নবীনতম মহকুমা শহর। ১৯৯৯ সালের ১৫ ই ডিসেম্বর ডোমকল মহকুমার কাজ শু(হয়। মূল ডোমকল শহর আজিমগঞ্জ গোলা নামে পরিচিত ছিল। এখনও গ্রাম পঞ্চায়েতটির নাম আজিমগঞ্জগোলা গ্রাম পঞ্চায়েত। রাণীনগর-১, রাণীনগর-২, ডোমকল ও জলঙ্গী ব্লক মিলে গঠিত হয়েছে ডোমকল মহকুমা। এটিই জেলার একমাত্র মহকুমা যে মহকুমায় কোন পৌরসভা নেই বা নেই কোন রেললাইন।

বাগড়ী এলাকার জনবসতি অপে(াকৃত নবীন বলে এখানে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি নেই। ডোমকল কুঠী বলে পরিচিত জায়গাটিতে একদা একটি নীলকুঠী ছিল। সেটি এখন বিক্রি(হয়ে গেছে জনৈক মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর কাছে। ভেঙেচুরে নতুন করে গড়ে তোলা ঐতিহাসিক সেই নীলকুঠী এখন পাটের আড়ত। এখানে রয়েছে শতবর্ষ প্রাচীন বিদ্যালয় ডোমকল ভবতারণ উচ্চ বিদ্যালয়। সম্প্রতি বেসরকারী উদ্যোগে এখানে গড়ে উঠেছে একটি ইঞ্জিয়ারিং কলেজ। এখানে আছে একটি কলেজও। কৃষিনির্ভর এ মহকুমায় কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকলেও তা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। সম্প্রতি ডোমকলকে পুরসভার মর্যাদা দেওয়ার প্রস্তাব উঠেছে। এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে ডোমকলই হবে এই মহকুমার একমাত্র পৌরসভা।

নগর ঃ শেরপুরের সাড়ে ছয় কিলোমিটার দ(িণে, বাদশাহী সড়কের পাশে, নগর এক বাণিজ্য প্রধান গ্রাম। এখান শাহ্ চাঁদ ফকির বা 'দাদাপীরে'র সমাধি বর্তমান। দাদাপীর হুসেন শাহের সমসাময়িক ও অলৌকিক (মতার অধিকারী ছিলেন বলে কথিত। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে ১৪ ই পৌষ এখানে এক বড় মেলা বসে। দাদাপীর বা দাতাবীর বা দাতাপীরের আস্থানাটি একটি আটচালা কুঁড়েঘর । ঘরের মধ্যে দাদাপীরের ও বারান্দায় তাঁর প্রধান শিষ্যশাহ্ মোরাদের (ইনি একজন

স্থানীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন) সমাধি আছে। আস্তানাটি এক পুষ্করিণীর দ(ণ তীরে অবস্থিত। সে জলাশয় পীর সাহেবের সমসাময়িক রত্নাকর নামে জনৈক রাজার খনিত বলে কথিত। দীঘির পশ্চিম পাড়ে জলের মধ্যে কয়েকটি ইষ্টক নির্মিত ঢিপি দেখা যায়, যেখান থেকে , প্রায় ৫০ বছর আগে, পাথরের একটি গণেশমূর্তি, (োদিত চৌকাঠ, নক্শা-করা ইঁট, ভগ্ন দেবদেবীমূর্তি ও মৃৎপাত্র প্রভৃতি পাওয়া গিয়েছিল। সুতরাং নগরও যে প্রাচীন স্থান সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। দীঘির উত্তর পাড়ে দুটি প্রাচীন সমাধি দেখা যায়।

পাঁচথুপি ঃ পাঁচথুপি বাসস্ট্যান্ড থেকে উত্তরপূর্ব্ব কোণে দেড় কিমি দূরে বারকোণা দেউল। একদা বিশাল এলাকা জুড়ে ছিল বিশাল আয়তনের সুউচ্চ মন্দির বা মঠ। এখন কোন কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। কান্দী থেকে দ(ণে পাকারাস্তায় ১৫ কিমি দূরে পাঁচথুপি অবস্থিত। গ্রামে ১১টি রাধা-কৃষ(মন্দির, ১০টি সুপ্রাচীন শিবমন্দির, ২টি মঠ এবং ৭টি মসজিদ আছে। ১০টি শিব মন্দিরের মধ্যে একটিতে পঞ্চমুখী শিবলিঙ্গ। এই শিবমন্দিরটিই সব থেকে প্রাচীন বলে মনে হয়। উল্লিখিত মন্দিরটির বাহিরের দেওয়ালে পোড়ামাটির উচ্চস্তরের কাজ আছে। এছাড়া আছে নবরত্ন শিব মন্দির। নবরত্ন শিব হিসেবে অর্চিত শিবলিঙ্গটি আয়তনে সুবৃহৎ ও কষ্টিপাথরে নির্মিত। মন্দিরের মূলক(র ভিতরের দেয়াল সংলগ্ন চারটি কোণের (দ্র মন্দিরে শ্বেত পাথরের নির্মিত চারটি শিবলিঙ্গ আছে। উদ্দিষ্ট মন্দিরটির চত্বরের চারদিকে আছে চারটি নাতি উচ্চ শিবমন্দির। মন্দিরগাত্রে টেরাকোটা কাজের নিদর্শন। কার্ত্তিক, গণেশ, কালী, গ(ড়, নারায়ণ, হনুমান ইত্যাদির ভাস্কর্য ছাড়াও চোখে পড়ে খোলকরতাল সহ কীর্তন দলের ছবি।

নবরত্ন শিবমন্দিরের তুলনায় সিংহবাহিনীর মন্দির অনেক পরবর্তীকালের। সিংহবাহিনীর মন্দির একটি পারিবারিক মন্দির হলেও জনপ্রিয়তায় সর্ব্বজনীনতার রূপ পেয়েছে। মন্দিরের বাঁ দিকের প্রবেশ পথের সম্মুখে বাঁদিকে শুভ্র জটাধারী মহাকাল শিবের প্রহরী মূর্তি। মন্দিরটির উত্তরদিকে চোখে পড়ে ধ্যানমগ্ন শিবমূর্তি। কাছেই উপবিষ্ট বৃষ। অর্দ্ধস্ফুট দীর্ঘ পদ্মকোরকরূপে যেন বিকশিত হয়ে উঠেছে মন্দিরটি। সুউচ্চ মন্দির শীর্ষে চোখে পড়ে পেচক, হনুমান, গ(ড় ও প্রহরী রূপী শংকর মূর্তি। ভৈরবী, ভুবনে(শ্বরী, ষোড়শী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা, কালী, তারা এই দশটি মহাবিদ্যার প্রতিটি মূর্তির নিচে পয়ার ছন্দে লিখিত মূর্তি পরিচিতি ল(্য করা যায়। মন্দির প্রকোষ্ঠের ভিতর অষ্টধাতু নির্মিত সিংহবাহিনীর মূর্তি। পারিবারিক নিত্যপূজা ছাড়াও অগণিত ভক্ত(মন্ডলীর পূজা আসে।

পাঁচথুপির দুর্গোৎসব ঃ পাঁচথুপির দুর্গোৎসবগুলির মধ্যে বৈষ(ব ও শাক্ত(উভয় ধর্মেরই প্রাধান্য ল(্য করা যায়। পাঁচথুপিতে মোট ১৮টি কৌলিক (পারিবারিক) দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বোধনের দিন থেকেই পূজাপর্বের আদিপর্ব শু(হয়ে যায়। মূল পূজা শু(ষষ্ঠীর দিন থেকে। পাঁচথুপির কৌলিক দুর্গাপূজার ধূমধাম সহ আরতি দেখবার জন্য পা(শ্ববর্তী গ্রামগুলি ছাড়াও কান্দী, বহরমপুর এমনকি কলকাতা থেকেও আগ্রহী দর্শক মন্ডলী আসেন। একুশটি প্রদীপের আরতি এখানকার দুর্গাপূজার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সিংহবাহিনী দুর্গার বাড়ীতে মহিষবলি দেখবার জন্য যথেষ্ট ভিড় হয়। বিজয়ার দিন কুমারী পূজা হয়। এই পূজার মধ্যে নূতনত্ব আছে। সাধারণত অন্যান্য পারিবারিক পূজায় অষ্টমীর দিন কুমারী পুজো হয়।

জনার্দন মন্দির ঃ বৈষ(ব বাড়ীর জনার্দন মন্দিরের দেওয়ালে কা(কার্য প্রাচীন। মন্দির গাত্রে বাঁশি, পদ্ম, উদিত সূর্য ইত্যাদি কা(কার্যের শিল্পমাধুর্য সহজেই চোখে পড়ে।

অন্যতম দ্রষ্টব্য ঃ বাণী মন্দির (শহর গ্রন্থাগার), পাঁচথুপির অতীত গৌরবময় ঐতিহ্যের সা(্য আজো বহন করে চলেছে উক্ত(পাঠাগারটি। বৃহৎ এই পাঠাগার ভবনটির দ্বারোদঘাটন করেন ভারত বিখ্যাত দেশপ্রেমিক বিপিনচন্দ্র পাল। বাণী মন্দিরের নিজস্ব হাতে লেখা পত্রিকার নাম 'বাণী'। বিখ্যাত সাহিত্যিক অন্নদাশংকর রায়ও 'বাণী' পত্রিকায় লিখেছেন।

বিদ্রোহী কবি নজ(ল ইসলামের মন্তব্য বাণীমন্দিরের পরিদর্শন খাতাকে ধন্য করেছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুও কর্মোপল(্যে বেশ কয়েকবার পাঁচথুপি এসেছেন। সেদিক থেকে দেখতে গেলে পাঁচথুপি বহু বিখ্যাত মানুষের স্মৃতি বিজড়িত জায়গা।

ফরাক্কাঃ মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ফরাক্কা আজ কেবল পশ্চিমবঙ্গে বা ভারতবর্ষেই নয় সমগ্র বি(শ্বেই এক সুপরিচিত নাম। দুই কিলোমিটার দীর্ঘ ৫৫ মিটার প্রশস্ত বি(শ্বের দীর্ঘতম নদীবাঁধ (ব্যারেজ) তৈরী হয়েছে এই ফরাক্কায়। এই বাঁধটি প্রযুক্তি(বিদ্যার এক বিস্ময়কর নিদর্শন। ফরাক্কা ব্যারেজের পর এখানে নির্মিত হয়েছে এক বিশাল তাপবিদ্যুত কেন্দ্র। ফরাক্কা আজ জেলার একমাত্র শিল্প নগরী। ফরাক্কার অতীতও অশেষ গৌরবময়। মুর্শিদাবাদ জেলার প্রাচীনতম ইতিহাস ও সভ্যতার নিদর্শনও এই ফরাক্কাতেও পাওয়া গিয়েছে।

ফরাক্কা বাঁধ নির্মাণের কাজ ১৯৬৩ সালে আরম্ভ হয়ে শেষ হয় ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে। বাঁধ থেকে আহিরণ পর্যন্ত ৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ

২০০মিটার প্রশস্ত একটি খাল (ফীডার ক্যানেল) কেটে গঙ্গাকে ভাগীরথীর সঙ্গে যুক্ত(করা হয়েছে। ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ কার্য শু(হয়ে১৯৮২ তে প্রথম পর্যায়ের কাজ (মোট ৬৩০ মেগাওয়াট (মতা সম্পন্ন) শেষ হয়। পরে ৫০০ মেগাওয়াট শক্তি(সম্পন্ন আরও দুটি ইউনিট স্থাপিত হয়েছে। জাতীয় তাপবিদ্যুৎ নিগম কর্তৃক স্থাপিত এত বড় তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র পূর্বে ভারতে আর নাই।

ফরাক্কা বাঁধ নির্মাণের সময় ফরাক্কায় একটি উপনগরী গড়ে উঠেছে। এই বাঁধের উপর দিয়ে রেলপথ এবং ৩৪ নং জাতীয় সড়ক প্রসারিত হয়েছে ফলে কলকাতা এবং দ(ণবঙ্গ সহ ভারতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ ও আসামের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হওয়ার ফলে ফরাক্কায় কর্মসূত্রে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু মানুষের সমাগম হয়েছে। ফলে আরও তিনটি উপ নগরী গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন প্রাথমিক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছাড়াও একটি কলেজও এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিউ ফরাক্কা জংশন স্টেশন দিয়ে রেলপথে ভারতের বহু স্থানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। ফরাক্কা ব্যারেজ টাউনশিপের লোকসংখ্যা বর্তমানে প্রায় ২২,০০০(২০০১)।

ফরিদপুর ঃ শিয়ালদহ-লালগোলা রেলপথে কলকাতা থেকে ১৫৯ কিলোমিটার উত্তরে অথবা বহরমপুর থেকে রেলপথে ও জাতীয় সড়কে ২৭ কিলোমিটার দ(ণে রেজিনগর রেলস্টেশন। রেজিনগর আগে বেলডাঙ্গা থানার অন্তর্গত ছিল, এখন রেজিনগরেই একটি থানা হয়েছে। রেজিনগর স্টেশন থেকে তিন কিলোমিটার পশ্চিমে মোরামের রাস্তায় ফরিদপুর গ্রাম। এখানে পীর ফরিদ সাহেবের দর্শনীয় সমাধিভবনটি অবস্থিত। বহু নর-নারী পীর সাহেবকে শ্রদ্ধা জানাতে এখানে সমবেত হন। এই ফরিদ সাহেবের নাম অনুসারেই গ্রামের নাম ফরিদপুর।

এই ফরিদপুরেই নবাব সিরাজ-উদ্-দৌল্লার বি(স্ত সেনাপতি মীরমদনের সমাধি। পলাশীর যুদ্ধে মীরমদন নিহত হলে তাঁর মৃতদেহ এই গ্রামে নিয়ে এসে পীর সাহেবের সমাধির অদূরে সমাহিত করা হয়। কথিত আছে মীরমদনের শেষ ইচ্ছা অনুসারেই তাঁকে পীর সাহেবের সন্নিকটে সমাধিস্থ করা হয়। পীরের সমাধির অব্যবহিত পশ্চিমে প্রাচীরঘেরা একটি নিতান্ত অপরিসর উন্মুক্ত(স্থানে তাঁর অতি সাধারণ কবর। অনেকটা তুলসীমঞ্চের মত একটি (দ্রাকার গম্বুজশীর্ষ স্তম্ভের গায়ে মর্মর ফলকে ইংরেজী ও ফার্সী ভাষায় তাঁর পরিচয় উৎকীর্ণ। অত্যন্ত অবহেলিত অবস্থায় পড়ে-থাকা এই সমাধিটি সংস্কার করা হয়েছে। তবে পীর সাহেবের আড়ম্বরপূর্ণ সমাধির পাশে মীর মদনের সমাধিটি একেবারেই নিষ্প্রভ। সমাধিটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক সংর(ত।

বনওয়ারীবাদ ঃ বর্ধমান জেলার সীমান্তে মুর্শিদাবাদ জেলার দ(ণপ্রান্তে ভরতপুর (বর্তমানে সালার) থানার ঘনবসতিপূর্ণ গ্রাম সোনা(ন্দি বনওয়ারীবাদ। গ্রামের পূর্বদিকের অঞ্চলটি বনওয়ারীবাদ। সোনা(ন্দির নিত্যানন্দ দালাল (জন্ম ১৭৫২ খৃষ্টাব্দ) মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমের সময় (১৭৫৯-১৮০৬) দিল্লী দরবারে মুন্সীর পদ লাভ করে প্রভূত বিত্ত, সম্মান ও খ্যাতি অর্জন করেন। সম্রাট তাঁকে মহারাজা উপাধি দেন এবং সপ্তহাজারী (সাত হাজার সৈন্যের অধিনায়ক) পদে নিযুক্ত(করেন। তিনি স্বগ্রামে প্রাসাদ ও বনওয়ারীজীর বিশাল মন্দির নির্মাণ করেন। বনওয়ারীজীর নাম থেকে সোনা(ন্দির এই অংশের নাম হয় বনওয়ারীবাদ। গ্রামের প্রধান রাস্তার পশ্চিমদিকে একটি দোতলা তোরণের পর বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে রাজবাড়ীর নানা মহলের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

১৭৩১ শকাব্দে (১৮০৯ খৃষ্টাব্দ) মন্দির নির্মিত হয়। বিশাল চত্বরের তিন দিকে দোতলা দালান, উত্তর দিকে বনয়ারীজীর প্রকাণ্ড একতলা দালান মন্দির। মন্দিরে বংশীধারী বনওয়ারীজী ('বনমালী') ও শ্রী রাধিকার অতি সুন্দর বিগ্রহ। মন্দিরের নির্মাণে মোগল স্থাপত্যের (স্তম্ভ, খিলান প্রভৃতি) প্রভাব আছে। মন্দিরের বাহিরের দোতলা অংশটিও মোগল স্থাপত্যে নির্মিত। রক্ত(াভ বেলে পাথরের খিলান ও জাফরিগুলি দিল্লী-আগ্রার কথা মনে করিয়ে দেয়।

রাজবাড়ী এবং রাজবংশের এখন আর সে অবস্থা নাই, সবই প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত। রাজবাড়ী তার আশেপাশে বহু পুষ্করিণী সংলগ্ন বাগান, চত্বর, বেদী প্রভৃতি এখনও দেখা যায়। বৃন্দাবনের অনুকরণে এগুলিকে 'বন' নামে অভিহিত করা হয়। বৃন্দাবনের মতই এই রকম ৮৪টি বন বনওয়ারীবাদে স্থাপন করা হয়েছিল। এখন সেগুলির নাম ছাড়া পুরাতন গৌরবের আর কিছুই অবশিষ্ট নাই।

কাটোয়া-আজিমগঞ্জ শাখা রেলপথে গঙ্গাটিকুরি স্টেশন থেকে পাকা রাস্তায় পাঁচ কিলোমিটার পশ্চিমে বনওয়ারীবাদ যাওয়া যায়। বহরমপুর থেকে সরাসরি বাসেও বনওয়ারীবাদ যাওয়ার ব্যবস্থা আছে।

বড়নগর ঃ ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত বড়নগর। আজিমগঞ্জ রেলস্টেশন থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার উত্তরে। নদীর অপর পারে সাধকবাগ। এখানে আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাস করেছেন নাটোরের

(বাংলাদেশ) রাজা রামকান্তের বিধবা পত্নী পুণ্যশীলা রাণী ভবানী। বড়নগর ছিল সে আমলে একটি গঞ্জ, ইউরোপীয় বণিকেরাও আসত বাণিজ্য করতে। আজকের খাগড়ার কাঁসারিদের অনেকেরই পূর্বপু(ষ ছিলেন বড়নগরের বাসিন্দা। বড়নগরের পিতলের ঘড়া ছিল বিখ্যাত। শিব মন্দিরের প্রাচুর্যের জন্য এ জায়গাটিকে বলা হত দ্বিতীয় বারাণসী। মন্দিরগুলির বেশিরভাগ রাণী ভবানীর তৈরি। মন্দিরগুলির মধ্যে ভবানী(ের ও চারবাংলা ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক সর্বে(ণ দেখভাল করে। অন্যান্য মন্দিরগুলি জীর্ণ, ভাঙাচোরা। অথবা যে কয়েকটি বর্তমানে অবশিষ্ট আছে তা অসামান্য, অজ্ঞাতনামা টেরাকোটা শিল্পীদের ধ্যানের ধনে ঋদ্ধ। সবথেকে দর্শনীয় হল রাণী ভবাণীর সময়ে নির্মিত টেরাকোটা অলংকৃত চারবাংলা একটি চারকোনা আঙিনার চারিদিকে চারটি বাংলা দোচালা মন্দির। বারান্দা সমেত প্রতিটি মন্দির ৯১/২ X ৪১/৪ X ৫ মিটার। প্রতিটি মন্দিরে তিনটি খিলান, খিলানের নিচে তিনটি দরজা, তিনটি শিবলিঙ্গ। মন্দিরের ভিত ১.৫ মিটার উঁচু। প্রতিটি মন্দিরের সামনের দিকে টেরাকোটার বিস্ময়কর ভাস্কর্য। উত্তরের মন্দিরের টেরোকোটার কাজ সবচেয়ে সুন্দর। এক একটি (ুদ্রকায় ইঁটের ফলকে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী, কৃষ(লীলা, পুরাণের নানা প্রসঙ্গ রূপায়িত। এই মন্দিরগুচ্ছের উত্তর-পশ্চিমে রাণী ভবানীর তৈরী আটকোনা ভবানী(ের মন্দির। মন্দিরের আটদিকে বারান্দাপথ ঢালু ছাদে ঢাকা। মন্দিরের গায়ে কোথাও কোথাও এখনও আগের চুন বালির অলংকরণ দেখা যায়। এর উচ্চতা প্রায় ১৮ মিটার। মন্দিরের ছাদ উল্টান পদ্মের মত দেখতে একটি গম্বুজের অকৃতিবিশিষ্ঠ। চূড়ায় একটি বিশাল পদ্মের আটটি পাপড়ি আট দিকে ছড়ান। মন্দিরের নির্মাণকাল সম্ভবত ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দ। ভবানী(ের মন্দিরের কিছুটা পশ্চিমে রাণী ভবানী প্রতিষ্ঠিত রাজরাজে(েরী মন্দিরে সিংহবাহন দশভূজা দুর্গামূর্তি, বাঁয়ে পিতলের দশভূজা, জয়দুর্গা ও ক(ণাময়ী মূর্তি ছিল, মূর্তি তিনটিই চুরি গেছে, পূজারী ঘটেই পূজো করেন। এই মন্দিরের কাছেই ছিল রাজা উদয়নারায়ণের গৃহদেবতা মদনগোপালের মন্দির। মহালক্ষ্মী ও হয়গ্রীব বিষু(মূর্তিও ছিল এই মন্দিরে। এখন এই তিনমূর্তি একত্রে স্থান পেয়েছে রাজরাজে(েরী মন্দিরের একটি ঘরে। অষ্টভুজ গণেশ মূর্তির মন্দির আর দেখা যায় না। রাণী ভবানীর বিধবা কন্যা তারাসুন্দরীর তৈরী গোপাল মন্দিরে পূজিত হ'ত কষ্টিপাথরের গোপাল মূর্তি। মন্দির তৈরী হয় ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। এর কাছেই তারকে(ের শিবমন্দির।

রাণী ভবানীর গু(বংশের বাসস্থান ছিল মঠবাড়ি এলাকা। এখানকার গঙ্গে(ের জোড়বাংলা মন্দিরটি এখনও দর্শনীয়। এখানেও টেরাকোটার নানা কা(কার্য দর্শক মনে বিস্ময় জাগায়। মন্দিরটি রাজ্য পুরাতাত্ত্বিক দপ্তর দ্বারা সংর(িত।

ত্রিশ চল্লিশ বছর আগেও এখান থেকে কিরীটে(েরী যাওয়ার জলপথ হিসাবে খালের ()ীণ চিহ(দেখা যেত।

বাংলা মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হিসাবে বড়নগরের এই নিভৃত পল্লী দর্শনীয় স্থান।

বহরমপুর ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর ষাটের দশকে ব্রহ্মপুর মৌজায় ৪০০ বিঘা সমতলভূমিতে যে সেনানিবাস নির্মাণ করা হয়েছিল তার প্রে(াপট ছিল, আত্মর(া ও নবাবী কাজকর্মের উপর নজরদারি।

ব্রহ্মপুর কতদিনের জনপদ জানা যায়না, তবে সরকারী রাজস্ব বিভাগের নথিপত্রে ব্রহ্মপুর মৌজার নাম উল্লেখ আছে। মিঃ বিভারিজ তাঁর Old Places of Murshidabad, (Calcutta Review 1892) শীর্ষক প্রবন্ধে ব্রহ্মপুর সম্পর্কে এই মত পোষণ করেছেন যে, এই শহর ব্রহ্মের বা ব্রহ্মার নগর, মৌজা বা গ্রামের নাম ব্রহ্মপুর। ব্রহ্মপুর উচ্চারণ দোষে বেরহামপুর ও পরবর্তীকালে বর্ণান্তরিত হয়ে বহরমপুরে পরিণত হয়েছে

বহরমপুর, জেলার সদর শহর। ভাগীরথীর পূর্ব-পাড়ে, মুর্শিদাবাদ শহর থেকে ছয় মাইল দ()িণে, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬৫ ফুট উপরে ভাগীরথী ও গঙ্গার বিভাজন রেখা থেকে ৩০ মাইল নিচে এবং কলকাতা থেকে ১৮৫ কিলোমিটার উত্তরে বহরমপুর কোর্ট ষ্টেশন। হাওড়া অজিমগঞ্জ রেলপথে ১৯৮ কিলোমিটার দূরত্বে খাগড়াঘাট রোড ষ্টেশন এবং ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে কলকাতা থেকে ১৯৫ কিলোমিটার উত্তরে এই শহর।

১৯১১ সালের জনগণনা অনুসারে এই শহরের জনসংখ্যা ২৬, ১৪০ জন, তার মধ্যে ২১,৫২৪ জন হিন্দু ৪,২৯৩ জন মুসলমান, এবং ২৮৮ জন খ্রীষ্টান। ১৮৮১ সাল থেকে জনসংখ্যা ত্র(মশ বৃদ্ধির দিকে।

পলাশী যুদ্ধের কয়েক মাস পরেই সেনা ছাউনি হিসাবে বহরমপুরের নাম প্রস্তাব করা হয়, কিন্তু তখন এই প্রস্তাব কার্যকর হয়নি। কিন্তু ১৭৬৩ সালে মীরকাশিমের সাথে যুদ্ধের পর এই সেনা ছাউনি বা সেনা নিবাসের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই স্থান নির্বাচনের প্রধান কারণ ছিল, জায়গাটি মুর্শিদাবাদের নিকটবর্তী ও স্বাস্থ্যকর।

হান্টারের তথ্য থেকে জানা যায় যে এই সেনা নিবাসের নির্মাণ কার্য ১৭৬৭ সালে শেষ হয়। সেই সময় এই সেনানিবাস বাংলার সৈন্যবাহিনীর উত্তর সীমান্ত ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করা হ'ত। এই ব্যারাক নির্মাণ করতে ব্যয় হয়েছিল ৩,০২,২৭০ পাউন্ড।

এই ব্যারাক নির্মাণের প্রধান বাস্তুকার ছিলেন কর্ণেল এ. ক্যাম্পবেল। ১৭৮৬ সালে সিয়ার-উল্-মুতা(রীণে এই ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, 'বহরমপুরের ব্যারাক সুন্দরতম এবং সর্বোৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যকর জায়গা। যে কোন জাতি-দেশ, এই জায়গার জন্য গর্ব অনুভব করতে পারে। এখানে দুই রেজিমেন্ট ইউরোপীয় সৈন্য, সাত বা আট রেজিমেন্ট সিপাহী এবং পনের ষোলটি কামান আছে। এতৎসত্বেও লোকে বলাবলি করে মুর্শিদাবাদে মুসলমান এত বেশী যে তারা ইঁট ছুঁড়েই ইংরেজদের ভূ-পাতিত করতে পারে।'

এই সেনানিবাসকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে বহরমপুর শহর। ৪০০ বিঘা জমির উপর সেনানিবাসটি নির্মিত হলেও পরবর্তী কালে আয়তন বৃদ্ধি পায়। যে মৌজা গুলি নিয়ে বহরমপুর তৈরী হয়, সেই সব মৌজাগুলির অধিকাংশ অবলুপ্ত, কিছু মৌজা গোরাবাজারের সাথে যুক্ত(হওয়ার জন্য তাদের আলাদা অস্তিত্ব পাওয়া যায় না।

গোরাবাজার ছিল মূলত গড় বহরমপুরের বাজার, উত্তর - পশ্চিম অঞ্চল থেকে আসা উর্দুভাষী অবাঙ্গালীদের বাসস্থান, যাঁরা ক্যান্টনমেন্টে জিনিস পত্র সরবরাহ করতেন।

পুরোনো সেনানিবাস বা ব্যারাক বহরমপুর শহরের প্রধান অঞ্চল। ভাগীরথী নদীর পূর্বতীরে এই সেনানিবাস তৈরী হয়েছিল। পূর্বদিকে তিনটি দ্বিতল বাড়ি সাধারণ সৈনিকের বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, উত্তর ও দ(ণ দিকের বাড়িগুলিতে নিম্নপদস্থ আধিকারিকগণ, পশ্চিম দিকের বাড়িগুলিতে বসবাস করতেন প্রধান সেনাধ্য(এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারী বৃন্দ। মাঠের পশ্চিমদিকের দ(ণ প্রান্তের বাড়িটিতে ও সংলগ্ন অতিথি শালায় ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেস্টিংস বসবাস করেছিলেন বলে শোনা যায়। ব্যারাক স্কোয়ারের উত্তর পূর্ব কোণে ছিল ইউরোপিয়ান ক্লাব ও উপাসনা গৃহ। ক্লাবটি বর্তমান কিন্তু উপাসনা গৃহটির কোন হদিশ পাওয়া যায় না। ব্যারাক স্কোয়ারের উত্তর-পশ্চিম কোণে ছিল অস্ত্রাগার। দেশীয় সৈন্যদের আবাসন ছিল রেলস্টেশনের কাছে। বাবুলবোনার দ(ণে ছিল রেজিমেন্ট হাসপাতাল। প্রধান হাসপাতাল ছিল বোর্স্টাল জেলের বাড়িটিতে (বর্তমানে মানসিক হাসপাতাল)। পরবর্তীকালে ১৮৭৩ সালে মাদাপুর থেকে জেলখানা স্থানান্তরিত হয়। ক্যান্টনমেন্টের দ(ণ প্রান্তে ছিল সামরিক জেলখানা। ১৮৭৪ সালে মাদাপুর থেকে পাগলাগারদটি এখানে স্থানান্তরিত হয়।

ব্যারাক স্কোয়ারের উত্তরে বর্তমান কৃষ(নাথ রোডে, যোসেফ ম্যারিওনের বাড়িটিতে স্থাপিত হয় গ্র্যান্ট হল, তৎকালীন বড়লাট ও ছোট লাট স্যার জন পিটার গ্র্যান্টের নামে এই ক্লাবটি তৈরী হয় ১৮৬৬ সালে। ১৯০৭ সালে লালগোলা মহারাজার উদ্যোগে এই ক্লাবটি পুনর্নির্মাণ করা হয়। এই ক্লাবটির পশ্চিমে বিশাল জলাধারটি নির্মাণ করেন মহারাণী স্বর্ণময়ী। ১৮৯৭সালে স্বর্ণময়ী প্রকল্পের কর্ম কান্ড শু(করলেও সমাপ্ত করেন মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

এই বিশাল জলাধারের পশ্চিমপ্রান্তে আর্মেনিয়ান কুঠিয়াল সাহেব এস. এন. ভার্দোন সাহেবের বাড়ীর যায়গায় ১৯১১ সালে স্থাপিত হয় কৃষ(নাথ কলেজ স্কুলের বর্তমান ভবনটি। ১৮৫৩ সালে বহরমপুর কলেজ স্থাপিত হয়। কলেজের বর্তমান ভবনটি সারাসনিক গথিক রীতিতে ১৮৫৯ সালে নির্মিত হয়। এই কলেজ ভবনটি ভারতবর্ষের মধ্যে অদ্বিতীয়।

১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ সরকারের বি(দ্ধে যে সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল তার সূচনা বহরমপুরের সেনা নিবাসেই হয়েছিল। ১৯ তম বাহিনীর এই বিদ্রোহের কথা তৎকালীন বাংলার লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নর স্যার ফ্রেডারিক জেমস্ হ্যালিডে ১৮৫৮ সালে তাঁর স্টেট পেপার রিপোর্ট - এ বলেছেন, ১৮৫৭ সালে যে সিপাহী বিদ্রোহ হয়েছিল সেটি ছিল সংগঠিত মহাবিদ্রোহ এবং বহরমপুরে হয়েছিল এই বিদ্রোহের সূচনা।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে বেশ কিছু গোরা সৈন্য বহরমপুর সেনা নিবাসে নিয়ে আসা হয়, কিন্তু ১৮৭০ সাল নাগাদ এই সেনা নিবাসটি উঠিয়ে দেওয়া হয়।

১৮৫৭ সালের সেই সিপাহী বিদ্রোহের শতবার্ষিকীতে ১৯৫৭ সালে ব্যারাক স্কোয়ারের উত্তর পূর্ব কোণে, জেলা প্রশাসন থেকে একটি মনুমেন্ট স্থাপন করা হয়। বহরমপুর শহরের পূর্বে, রেললাইন পার হয়ে বর্তমান জেলা পরিষদের যে বাড়িটি, সেটি 'বর্মাকুঠী' নামে খ্যাত। তৃতীয় ইঙ্গ -বর্মা যুদ্ধে বর্মার রাজা থিবো পরাজিত ও বন্দী হয়ে এখানে অন্তরীণ হয়ে থাকেন। বন্দী অবস্থায় থিবোর মুত্যু হয়। তার সমাধি কেন্দ্রীয় রেশমাগার সীমানায় বর্তমান। এই বর্মাকুঠীর পশ্চিমে, রেললাইন পার হয়ে ডান দিকে বাবুলবোনা কুঠী। রেশম ব্যবসায়ের প্রধান কার্যালয় হিসাবে এক সময় এই কুঠী পরিচিত ছিল। কুঠীর অধ্য(ছিলেন মিঃ লায়াল, তাঁর নাম অনুসারে এটি 'লায়াল সাহেবের কুঠী' নামে পরিচিত এই কুঠী ও বর্তমান বহরমপুর কোর্ট রেল স্টেশনের মাঝখানে ছিল রেজিমেন্ট হাসপাতাল, বর্তমান সেটি রাজ্য রেশমাগার। এই রেশমাগারের পাশে, টেক্সটাইল কলেজের ছাত্র-আবাসনের পূর্ব দিকে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের বাম- পাশে ইংরেজদের সমাধি(ত্র। এই সমাধি(ত্রে বহু খ্যাতনামা ইংরেজদের সমাধি রয়েছে। এই প্রাচীন সমাধি (ত্র, কেন্দ্রীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ দ্বারা বর্তমানে সংস্কার করা হয়েছে।

বহরমপুর পৌরসভার অর্ন্তভুক্ত(প্রাচীনতম জনপদটির নাম সৈদাবাদ। সেরবন্দী রেশমের জন্য বিখ্যাত এই প্রচীন জনপদে আর্মেনীয় বণিকরা এসেছিলেন ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে। ১৭৫৮ সালে নির্মিত আর্মেনীয় চার্চ আজও বর্তমান। প্রার্থনা ক(মাতা মেরী ও যীশুর ছবিটি অপূর্ব। সৈদাবাদের উত্তরে মহারাজ - নন্দকুমারের স্মৃতি বিজড়িত কুঞ্জঘাটা রাজবাড়ী এবং উত্তর পূর্বে ফরাসডাঙ্গা। ১৬৮৮ খৃঃ ফরাসীদের কুঠী স্থাপিত হয়। প্রখ্যাত কূটনীতিবিদ ডুপে- ফরাসী - সরকারের প্রতিনিধি রূপে এই কুঠীবাড়ীতে বাস করেছিলেন।

সৈয়দাবাদের দ(ণে খাগড়া, এই জনবসতিটি গড়ে উঠে প্রধানত ঊনিশ শতকের প্রথম দিকে। এই অঞ্চলটি নল খাগড়ার জঙ্গল ছিল। ১৭৮৮ নাগাদ সালে নাগাদ ভাগীরথী তার গতিপথ পরিবর্তন করে বর্তমান খাতে বইতে শু(করলে জায়গাটি বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠে। ১৮১৩ সালে মহামারীর ফলে মুর্শিদাবাদে বহু অঞ্চল থেকে এসে এখানে বসবাস শু(করে। এই ভাবে সন্নিহিত অঞ্চল থেকে আসা মানুষ নিয়ে অতি দ্রুত খাগড়ার জনবসতি গড়ে উঠে।

বহরমপুর পৌরসভার এলাকা নির্ধারিত হয় ১৮৬৯ সালে কিন্তু পৌরসভার পত্তন হয় ১৮৭৬ সালের ১লা জুলাই। বহরমপুর পৌরসভার আয়তন ১৬.১৯ বর্গকিলোমিটার। লোকসংখ্যা ২০০১ সলের গণনা অনুসারে ১৬০০০০। ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত পৌরসভার ত্রিশটি ওয়ার্ড ছিল। ১৯৯৮ সালের নির্বাচনে ওয়ার্ড সংখ্যা কমিয়ে ২৩টি করা হয়। বহরমপুর শহরে প্রথম বিদ্যুৎ সরবরাহের সূচনা হয় ১৯৩২ সালে।

আধুনিক বহরমপুর শহর খুব বেশি দিনের নয়। বহরমপুর পৌরসভার প্রতিষ্ঠার সময় থেকে বহরমপুর শহর ত্র(মশ বেড়ে উঠেছে। বহরমপুরে ভাগীরথীর উপরে রামেন্দ্রসুন্দর সেতু নির্মাণের ফলে উত্তরবঙ্গের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হয়ে ওঠে। ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক এই শহরের মধ্যে দিয়ে প্রসারিত হয়েছে, ফলে উত্তরবঙ্গ, বিহার ও আসামের সাথে সড়ক পথে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে।

ভাগীরথীর পূর্বতীর বরাবর শহরের দ(ণ প্রান্ত থেকে উত্তর প্রান্তে তৃতীয় সড়ক নির্মিত হয়েছে। শহরের বিভিন্ন অঞ্চল সংস্কার করা হয়েছে, জন সংখ্যা বেড়ে চলেছে।

বেলডাঙ্গা ঃ বেলডাঙ্গা মুর্শিদাবাদ জেলার প্রায় দ(ণ প্রান্তে ৩৪ নং জাতীয় সড়ক ও কলকাতা-লালগোলা রেলপথ সংলগ্ন ব্যবসাকেন্দ্রিক শহর। মোগল আমলে ভাগীরথীর পূর্বতীর বরাবর বাঁধ নির্মাণের পরবর্তীকালে (অন্ততঃ ৪০ বছর) ভাগীরথীরই পরিত্যক্ত(কোন বিলের তীরবর্তী ডাঙ্গাভূমিতে এই পল্লীটির উদ্ভব ঘটেছিল। ১৮ শতকের মধ্যভাগে এক দশক জুড়ে বর্গীর হাঙ্গামায় রাঢ় অঞ্চলের উপদ্রুত বহু অবস্থাপন্ন ও উচ্চবর্গের উদ্বাস্তু মানুষ ভাগীরথী অতিত্র(ম করে ৪ কিমি দূরবর্তী এই জনপদে এসে বসতি স্থাপন করে। জনশ্রুতি একসময় বেলডাঙ্গা নাটোরের জমিদারীভুক্ত(ছিল। পরবর্তীকালে বেলডাঙ্গা নামের মহালটি (১১৬১ বর্গ মাইল, তৌজি নং ২৮০) ১৭৬০ সাল পর্যন্ত অনির্দিষ্টকাল বিখ্যাত জগৎ শেঠ পরিবারের খাসতালুক ছিল। তার পরবর্তী কালে মহালটি বিভিন্ন সময়ে কাশিমবাজার রাজপরিবারের প্রত্য(বা পরো(মালিকানায় ছিল স্বাধীনতা উত্তরকালে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হওয়া পর্যন্ত।

অন্যদিকে নিয়পশ্চাৎ ভূমি 'কালান্তর' অঞ্চলের মধ্যদেশ ভেদ করে বেলডাঙ্গা পাট, ধান ও ভূষি মালের বাজার ব্যবসা কেন্দ্র হিসাবে বিশেষ গু(ত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে এখানে শতাধিক বছর থেকে গড়ে উঠেছে গ(মোষ ছাগল ইত্যাদির বেচাকেনার বিখ্যাত হাট। সেই সময়ে এখানে সারা জেলার আমের কেন্দ্রীয় হাটও বসত। ৪/৫ হাজার গ(মোষের গাড়ি বোঝাই পাকা আমের আমদানী রপ্তানী ঘটত প্রতিদিন। ১৭৮০ সালের মেজর রেনেলের মানচিত্রেও তাই সবমিলিয়ে বেলডাঙ্গাকে বড় ব্যবসাকেন্দ্র বলেই স্পষ্ট নির্দেশ করা হয়েছিল। ১৯ শতকের প্রথমার্ধ থেকে এখানে ধীরে ধীরে রেশমকুঠী ও ব্যবসার বিস্তার ঘটে। সেই সূত্রে বেলডাঙ্গার কয়েক ঘর ধনী ব্যবসায়ী জমিদারীও গড়ে তোলেন। ১৯০৫ সালে রাণাঘাট-লালগোলা রেলপথ প্রসারিত হওয়ায় বেলডাঙ্গার শ্রীবৃদ্ধির পথ আরও সুগম হয়। ১৯২১ সালের আদম সুমারীতে বেলডাঙ্গা ৫ম শ্রেণীর শহরের স্বীকৃতি লাভ করে। ওই সময় রেলস্টেশন সংলগ্ন স্থানে চামড়ার ট্যানারী স্থাপিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে সেখানেই ১৯৩৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় চিনির কল। এই কলের মিলের দৌলতেও বেলডাঙ্গার মর্যাদা ও সমৃদ্ধি যথেষ্ট বেড়ে যায়। কিন্তু ১৪/১৫ বছর চলার পর দেশবিভাগের শিকার হয়ে মিলটি বন্ধ হয়ে যায়। প্রধানত তারই ফলে পঞ্চাশের দশকে সাময়িকভাবে বেলডাঙ্গা শহরের স্বীকৃতি থেকে অবনমিত হয়েছিল। দু'দশক পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মিলটি চালু করার উদ্দেশ্যে ত্র(য় করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই প্রচেষ্টা কার্যকর হয়নি।

ভগবানগোলা ঃ বহরমপুর থেকে রেল ও সড়কপথে ২৯ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে এখনকার ভগবানগোলা। জনশ্রুতি, হুসেন শাহ্-এর রাজত্বকালে মুকসূদন দাস নামক জনৈক নানকপন্থী সন্ন্যাসী

মুর্শিদাবাদে আসেন। তাঁর শিষ্য ভগবান দাস পদ্মাতীরে রঘুনাথের মন্দির এবং একটি গোলা বা বাজার স্থাপন করেন। ভগবান দাসের নাম থেকেই জনপদটির নাম হয় ভগবানগোলা। এই ঘটনা কতদূর সত্য বলা কঠিন, তবে সত্য হলে ভগবানগোলার পত্তন হয় অন্তত ষোড়শ শতকে।

বাংলায় মোগল শাসন প্রবর্তনের সময় (ষোড়শ শতকের শেষ ভাগ) থেকে ভগবানগোলার সমৃদ্ধি শু(। 'আইন-ই-আকবরী'তে সরকার মাহমুদাবাদের অন্তর্গত ভগবানগোলার উল্লেখ আছে। পদ্মার তীরবর্তী হওয়ায় এবং নিকটে ভাগীরথী, জলঙ্গী, ভৈরব, মহানন্দা প্রভৃতি অনেকগুলি নদী থাকায় ভগবানগোলা অতি দ্রুত দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। বাংলা ছাড়াও বিহার প্রভৃতি ভারতের অন্যান্য অঞ্চল, এমনকি ভারতের বাইরেও অনেক দেশের সঙ্গে ভগবানগোলার বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সতের শতকেই ভগবানগোলা একটি অত্যন্ত গু(ত্বপূর্ণ নদীবন্দরে পরিণত হয়।

আঠার শতকে মুর্শিদাবাদ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজধানী হয় এবং ভগবানগোলা মুর্শিদাবাদের প্রধান বন্দরে পরিণত হয়। এখানে রেশম এবং অন্যান্য বস্ত্রাদি এবং সব রকমের শস্য, ঘি, তেল প্রভৃতি বাংলায় উৎপন্ন বহুবিধ পণ্যসামগ্রীর কেনা-বেচা চলত। কাছাকাছি কাশিমবাজার, সৈদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে ইংরেজ এবং অন্যান্য ইউরোপীয়দের বাণিজ্যকুঠী থাকায় বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যের যথেষ্ট সুবিধা এবং প্রচলন ছিল। '....তৎকালে....ল(ল(মন শস্য, ঘৃত, তৈল প্রভৃতি দ্রব্যের আমদানী-রপ্তানী হইত। উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, রাঢ়, বিহার, সকল প্রদেশ হইতেই নানাবিধ দ্রব্যের আমদানি হইত এবং তৎসমুদয় সমগ্র ভারতে ও সমগ্র ইউরোপে বিস্তৃত হইয়া পড়িত। অত্রত্য বাজার বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের ধান্য, মুগ, কলাই, লঙ্কা, পলাণ্ডু প্রভৃতির নৌকা, তুলা রেশম, নীল ও বস্ত্রাদির আমদানিতে সর্বদাই সমারোহময় থাকিত।' (নিখিলনাথ রায়-মুর্শিদাবাদ কাহিনী)। ভগবানগোলার বাজার থেকে বার্ষিক ত্রিশ ল(টাকার শুল্ক আদায় হ'ত, কেবল বিভিন্ন শস্যের বাজার থেকেই পাওয়া যেত তিন ল(টাকা। এ থেকেই ভগবানগোলার বাণিজ্যের বিপুলতার পরিমাণ বোঝা যাবে।

১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহী শোভাসিংহের সহচর রহিম শাহ্ এই বন্দর-নগর আত্র(মণ ও লুণ্ঠনের চেষ্টা করেন এবং বেশ কিছুদিন বন্দর অবরোধ করে রাখেন। পরে বাংলার সুবাদার ইব্রাহিম খাঁর পুত্র জবরদস্ত খাঁর এর নিকট বিদ্রোহী সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়। আলীবর্দীর সময়ে (১৭৪১-৫৬) যেমন ভগবানগোলা সমৃদ্ধির চরম সীমায় উপনীত হয়, তেমনই ঐ সময়েই বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বর্গীরা আত্র(মণ ও লুণ্ঠন শু(করে। ভগবানগোলার সুর(ার জন্য এবং রাজধানী মুর্শিদাবাদে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের সরবরাহ অ(ুন্ন রাখার জন্য আলীবর্দী ভগবানগোলায় একটি স্থায়ী সামরিক ঘাঁটির ব্যবস্থা করেন। শত্রুর আত্র(মণ প্রতিহত করার জন্য পদ্মা থেকে গোবরা পর্যন্ত একটি খালও কাটা হয়। এতৎসত্ত্বেও ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে বর্গীরা ভগবানগোলা লুণ্ঠন ও ধ্বংস করে। তার আগে তারা চারবার আত্র(মণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।

পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌল্লা মুর্শিদাবাদ থেকে গোপনে ভগবানগোলায় এসে পদ্মা দিয়ে নৌকাযোগে রাজমহলের দিকে পলায়ন করেন। অবশ্য মালদহের কাছে তিনি ধৃত ও বন্দী হন এবং মুর্শিদাবাদে নিয়ে এসে তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়।

ভগবানগোলার এই সমৃদ্ধি বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। ঊনিশ শতকের প্রথম দিকেই পদ্মার প্রবাহ প্রায় আট কিলোমিটার পূর্বে সরে যায় এবং ভগবানগোলার বাণিজ্যও শেষ হয়ে যায়। পত্তন হয় নতুন ভগবানগোলার। এই ভগবানগোলার অবশ্য কোন মতেই পূর্বের ভগবানগোলার সমক(নয়।

বর্তমান ভগবানগোলাও (মহিষস্থলী?) অবশ্য মুর্শিদাবাদ জেলার একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। এখানে রাণাঘাট-লালগোলা রেলপথের একটি স্টেশন এবং একটি থানাও আছে। পূর্বেকার রঘুনাথ আখড়াটি নতুন ভগবানগোলায় নতুন করে নির্মিত হয়েছে। ভগবানগোলার নিকটস্থ মধ্যযুগের প্রসিদ্ধ তেলিয়া বুধুরি বৈষ(ব-আশ্রম এখন স্টেশনের সন্নিকটে নতুন মন্দিরে স্থানান্তরিত হয়েছে।

ভরতপুর ঃ ভরতপুর কান্দী থেকে সালার অভিমুখে কিম্বা সালার থেকে কান্দী অভিমুখে ১৩ কিমি দূরত্বে অবস্থিত ভরতপুর থানা। মহকুমা কান্দী, গ্রামটির আয়তন ২৫৪৯.৮৬ একর। লোকসংখ্যা ১০,৩১১, শি(ার হার ৩৫ শতাংশ। ভরতপুর একটি প্রাচীন, ইতিহাস প্রসিদ্ধ গ্রাম।

ভরতপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে ১ কিমি দূরে 'শ্রীপাট'। এই 'শ্রীপাট' বিখ্যাত পন্ডিত গদাধর গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত। গদাধর ও বাণীনাথ ভরতপুর গ্রামে শ্রী শ্রী গোষ্ঠনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। মহাপ্রভু যেদিন কাটোয়ার ভারতী আশ্রমে সন্ন্যাস দী(া গ্রহণান্তে বত্রে(শ্বর তীর্থগমন করেন, সেই সময় তাঁর প্রিয় সহচর গদাধর তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশ সম্ভূত মাধব মিশ্রের পুত্র গদাধর গোস্বামী ছিলেন মহাপ্রভু চৈতন্যের আবাল্য সহচর। তাঁর ভাই বাণীনাথ-এর

পুত্র নয়নানন্দ মিশ্র একজন বিখ্যাত বৈষ(ব পদকর্ত্তা। কথিত আছে গদাধর পন্ডিত নিজ গলায় র(িত একটি কৃষ(মূর্তি, দুইধারে সখি এবং স্বহস্ত লিখিত একখানি গীতা দিয়ে নয়নানন্দ মিশ্রকে ভরতপুর শ্রীপাটে রেখে প্রত্যহ পূজা করার আদেশ দেন। এই নয়নানন্দের বংশধররা এখন ভরতপুরে বাস করছেন।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের ভরতপুরে আগমন সম্পর্কে শোনা যায়, তিনি কাটোয়া, কাঞ্চনগড়িয়া (হরিদাসের শ্রীপাট) হয়ে ধোবাঘাট এবং ভরতপুরে পৌঁছান। ভরতপুরে এসে চৈতন্যদেব, গদাধর গোস্বামী লিখিত গীতার উপর একটি (-াক লিখে দেন বলে শোনা যায়।

গদাধর পন্ডিতের লিখিত গীতায় মহাপ্রভু কর্ত্তৃক যে লিখিত (-াকের কথা শোনা যায় সেই (-াকটি নিম্নরূপ ঃ

'ষটশতানি সবিংশানি (-াকানাং প্রাহ কেশবঃ
অর্জুন সপ্ত পঞ্চাশৎ সপ্ত ষষ্টিংচ সঞ্জয় ঃ
ধৃতরাষ্ট্র (-াক মেকং গীতায়া ফল মুচ্যতে।'

এই (-াকটি গীতার (-াক সমষ্টির পরিমাণ সূচক। উপরিলিখিত (-াকটির হস্তা(রের প্রতিলিপি 'সাহিত্য পরিষদে প্রকাশিত হয়েছে'।

আবার ভরতপুরে মুসলিম বসতির চিহ্(হিসেবে আজো দেখতে পাওয়া যায় শাহ্ হেদায়াতুল্লার এবং শাহ্ সিরাজুল আলমের মাজার। যা কয়েকশো বছরের প্রাচীন।

সেন আমলে ভরতপুর ছিল বৈষ(ব অধ্যুষিত গ্রাম। বর্তমানে এই গ্রামটিতে হিন্দু, মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের বাস। এখানে মুসলিম শতকরা ৬০ ভাগ এবং হিন্দু শতকরা ৪০ ভাগ। অতীতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে মনে রেখে দুই সম্প্রদায় মিলেমিশে বাস করে।

ভট্টবাটি (ভট্টমাটি) ঃ নবগ্রাম থানায় ভট্টবাটি (মৌজা, ১০৬ বিলবাড়ী) এককালে একটি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। এখানে নবাবী আমলে দ্বিতীয় কানুনগো জয়নারায়ণের বাসস্থান ছিল। প্রবাদ, হুসেন শাহ্-এর সময় দা(ণাত্যের কর্ণাট দেশ থেকে বারশ ঘর ভট্টব্রাহ্মণ এখানে এসে বসতি স্থাপন করেন। তবে এখন কোন ভট্টব্রাহ্মণই এখানে বাস করেন না। কানুনগোদের প্রাসাদ ও দেবস্থানগুলির চিহ্(মাত্রও অবশিষ্ট নাই। কেবল একটি জীর্ণ, ভগ্নপ্রায় সাধারণ আকারের দর্শনীয় পঞ্চরত্ন শিবমন্দির এখনও এই স্থানের অতীত গৌরবের সা(ী হয়ে আছে।

লালবাগের সদর ঘাট পার হয়ে লালবাগ-পলসণ্ডা রাস্তায় প্রায় পাঁচ কিলোমিটার পশ্চিমে ভট্টমাটি গ্রাম। পাকা রাস্তা থেকে আধ কিলোমিটার দ(ণে এই রত্নে(র মন্দির। দ(ণে একটি প্রবেশদ্বার যুক্ত(ত্রিরথ পঞ্চরত্ন মন্দিরটির বৈশিষ্ট্য। এর বাহিরের দেয়ালে সর্বত্র পোড়ামাটির অলঙ্করণ। বড়নগরের একটি 'একবাংলা' মন্দির ছাড়া মুর্শিদাবাদের আর কোন মন্দিরে এত অলঙ্করণ নাই। মন্দিরের দ(ণমুখী প্রবেশপথের অব্যবহিত উপরে ও দ্বারের দুই পাশের মূর্তির সারিগুলি এখন লুপ্ত। মন্দিরের শীর্ষ থেকে ভিত্তি পর্যন্ত সর্বত্র নানা বিষয়ে নানা বৈচিত্রের ও নানা আকারের অসংখ্য মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। প্রবেশদ্বারের খিলানের উপরে কার্ণিশে সূক্ষ্ম নক্সার উপরের সারিতে ছোট ছোট কুলঙ্গীতে নানা দেব-দেবীর (দ্র (দ্র মূর্তি। চারিদিকের চূড়াগুলি সহ মূল চূড়াটিও সমানভাবে অলঙ্কৃত। মন্দিরের চূড়াগুলি অনেকটা বহুকার্ণিশযুক্ত((দ্রাকৃতি চারচালা মন্দিরের মত। বর্গাকার মন্দিরের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ পাঁচ মিটার ও উচ্চতা আনুমানিক আট মিটার।

মন্দিরে প্রতিষ্ঠালিপি না থাকায় সঠিকভাবে বলা যায়না কে কবে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তবে মন্দিরের দ(ণে ঘাটবাঁধান পুষ্করিণীটির নাম কালীসাগর। এ থেকে মনে হয় এই মন্দির বঙ্গাধিকারী মহেন্দ্রনারায়ণের পুত্র বা উত্তরাধিকারী কালীনারায়ণের দ্বারা স্থাপিত। মহেন্দ্রনারায়ণ আলীবর্দীর সমসাময়িক। সুতরাং মন্দিরটি প্রায় আড়াইশ বছর আগে স্থাপিত হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়।

রাজ্য পুরাতত্ত্ব বিভাগ থেকে ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দে মন্দিরটির সংস্কার করা হয়।

মানিক্যহার ঃ মুর্শিদাবাদের সোনা(ন্দি-বনওয়ারীবাদ-এর রাজার গু(দেবকে প্রদত্ত জায়গীর এই মানিক্যহারে আছে ঊনিশ শতকের কষ্টিপাথরের রাধাকৃষ(জীউর প্রসিদ্ধ মন্দির। বর্তমানে প্রায় ১২৫টি পরিবার দ্বারা পালাত্র(মে এই রাধাকৃষ(পূজিত হন। গ্রামের সারি সারি প্রাচীন ভদ্রাসন ও দেবালয়গুলি গ্রামের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে। ঠাকুর পরিবার-এর কেউ কেউ এখনও ভক্ত(জনকে বৈষ(ব মন্ত্রে দী(া দেন। দোল, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি তিথিতে সমগ্র গ্রাম জুড়ে আসে উৎসবের আমেজ। নিত্য সেবায় বিতরিত হয় অন্ন-প্রসাদ।

মুর্শিদাবাদ ঃ মুর্শিদাবাদ শহরটি সাধারণ ভাবে লালবাগ নামে পরিচিত। দীর্ঘদিন ধরে এই শহরটি ছিল বাংলা বিহার উড়িষ্যার রাজধানী। বর্তমানে এটি মুর্শিদাবাদ জিয়াগঞ্জ ব্লকের অধীন একটি পৌর শহর। বহরমপুর শহরের উত্তরে ১০-১১ কিমি দূরে অবস্থিত এই শহরে নবাবী স্মৃতি বিজড়িত বহু দর্শনীয় স্থান রয়েছে।

নিজামত কেল্লা ঃ নিজামত কেল্লা এ জেলার সবচেয়ে সুন্দর দ্রষ্টব্য স্থান। শুধু এ জেলায় কেন, সারা পশ্চিম বাংলায় এমন কি অন্যান্য রাজ্যেও প্রশস্ত বহতা নদীর ধারে এমন মনোরম স্থান বোধ

হয় দ্বিতীয়টি নেই। নদীর উত্তর থেকে দ(ণ তীরে প্রায় ১ কিমি জুড়ে ৪১ একর বা ১২৩ বিঘে জমি নিয়ে এই কেল্লা। কেল্লার মধ্যে আছে হাজারদুয়ারী প্যালেস মিউজিয়ম, নিউ প্যালেস, তিনটি মসজিদ যার মধ্যে প্রায় একজাতীয় দুটি সাদা ও হলুদরঙা মসজিদ ঠিক নদীর ধার ঘেঁসে, মদিনা, ঘড়ি মিনার, ইমামবাড়া, উঁচু প্রাচীরে ঘেরা নবাব পরিবারের লোকজনদের থাকার জায়গা । কেল্লায় তিনটি প্রবেশ-পথ, চকগেট, ইমামবাড়া গেট এবং দ(ণ দরওয়াজা। দ(ণ দরওয়াজাই প্রধান প্রবেশপথ। দ(ণ দরওজার দোতলায় ছিল নহবৎ খানা। নহবৎ খানার ঘন্টার আওয়াজ মৃদু কম্পনে আকাশে ছড়িয়ে যেত। তিনটি সিঁড়ি বাঁধান ঘাট। মাঝের বাঁধন ঘাটটি একটি ছোট সেতুর তল দিয়ে। নদীর ধারে মোরামের রাস্তার পূর্বদিকে ওয়াসিফ আলি মির্জার 'পাহাড় বাগান' - এর আজ অস্তিত্ব নাই। নদীর ধারে ধারে শান্ত্রীর পাহারা দেওয়ার ছোট্ট ছোট্ট গুমটি ঘর।

১৮২৯ থেকে ১৮৩৭ নয় বছরে প্রায় ১৬ ল(টাকা ব্যয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ার ম্যাকলিয়ড ডান্‌কানের পরিকল্পনা অনুযায়ী আসল ও নকল মিলিয়ে হাজারএক দুয়ার যুক্ত(, এক ত্রিতল প্রাসাদ তৈরি হয় পাশ্চাত্য রীতিতে। হাজারদুয়ারী প্রাসাদটি আয়তনে ৪২৫´ x ২০০´ x ৮০´। প্রাসাদের ভেতরদিকে চারকোণে চারটি ঘোরানো লোহার সিঁড়ি। তাছাড়া ভেতরদিকে আরও কয়েকটি একতলা থেকে দোতলা, দোতলা থেকে তিন তলায় যাওয়ার সিঁড়ি আছে। প্রাসাদের সামনের দিক উত্তরমুখী। ৩৭টা চওড়া সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে হয়। প্রাসাদে অনেকগুলি লম্বা থাম। নবাবদের বাসস্থান হিসেবে তৈরী হলেও নবাবরা এখানে বাস করেননি একদিনও। তাই একসময় একে মিউজিয়ামে রূপান্তরিত করা হয়। ২৬ আগষ্ট, ১৯৯০ তারিখে নবরূপায়িত মিউজিয়াম পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন রাজ্যপাল নু(ল হাসান উদ্বোধন করেন। পূর্বতন ব্যাঙ্কোয়েট হল (ভোজ সভাগৃহ) বল(মের জায়গায় নানা জাতীয় প্রদর্শনীয় দ্রব্য রাখা আছে। একতলায় অস্ত্রাগার, মহাফেজখানা ও তোষাখানা। দোতলায় গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা প্রায় চৌদ্দ হাজার। বহুরকমের কোরাণ, হাতে লেখা আইন-ই-আকবরী এ গ্রন্থাগারের বিশিষ্ট সম্পদ। কয়েক হাজার উর্দু ও ফার্সী পান্ডুলিপি আছে। দরবার ক(রূপার সিংহাসনটি কাঁচের শো-কেসে র(ত। উপরে গম্বুজের চূড়া থেকে ঝুলন্ত চতুর্থ উইলিয়মের দেওয়া ১০১ শাখা বিশিষ্ট বেলোয়ারি ঝাড়বাতি। সুদৃশ্য পঙ্খের কা(কার্য ঘরের ছাদে ও দেওয়ালে। ঝাড়বাতির আলোয় অতি স্নিগ্ধ ও মনোরম মনে হয় দরবার ক(। পাশে কমিটি (ম বা নবাবের পরামর্শক(। দোতলায় উঠে প্রথম ঘরটিতে গিয়ে দাঁড়ালে দুটি ঐতিহাসিক ছবি চোখে পড়ে। এই ঘরের ভিডিও তে ছবি ও কথায় এই মিউজিয়মের দর্শনীয় বস্তুগুলি দেখান হয়। প্রাসাদে নবাব, দেওয়ান, নবাবপুত্র, এজেন্ট এদের সকলের তৈলচিত্র যেমন আছে তেমনি আছে নিসর্গ চিত্র, শেকস্‌পীয়রের বিভিন্ন নাটকের দৃশ্য, বেরা ভাসানের ছবি, শিকারের দৃশ্য প্রভৃতি। ৩.৫৬ মিটার x ৪.৮০ মিটার ক্যানভাসের ওপর বিশাল আকারের 'দ্য বেরিয়াল অব স্যার জন মুর' (স্যার জন মুরের সমাধি) তৈলচিত্রটি উল্লেখযোগ্য। ইংরেজ চিত্র শিল্পী মার্শালের আঁকা অন্ধকারে মশাল ও লন্ঠনের আলোয় স্যর জন মুরের মৃতদেহ কবর দেওয়ার দৃশ্যটি নিপুণ হাতের সৃষ্টি। চিনা মাটির ফুলদানি গুলি যেমন দামী, তেমনি বিচিত্র সূক্ষ্ম কা(কার্যে পূর্ণ।

হাজারদুয়ারীর সামনেই ১৮৪৮ সালে ফেরাদুন জাঁর তৈরি পশ্চিমবাংলার বৃহত্তম (৬৮০ ফুট লম্বা) দোতলা ইমামবাড়া তিন চত্বরে বিভক্ত(, প্রতিটি চত্বর চতুষ্কোন। দুই ইমারতের মাঝে একটি সবুজ ঘাসে ভরা মাঠ, যার পূর্বদিকে স্তম্ভ ঘড়ি ফেরাদুন জাঁর স্থাপিত। (১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে), পশ্চিমদিকে সিরাজের তৈরি মদিনা। হাজারদুয়ারী প্রাসাদের অদূরে ভাগীরথীর তীরে জরদ মসজিদ সিরাজের আর একটি কীর্তি। ঐ মাঠের মধ্যে বাচ্চাওয়ালী তোপ, ১৫ ফুট লম্বা, এ কামানটি চৌদ্দ শতকে তৈরি। নগরের প্রতির(া কাজে এটি ব্যবহার করা হ'ত।

নিউ প্যালেস দ(ণ দরওয়াজা থেকে কেল্লার ভেতর কিছু উত্তরে। দুধ-সাদা দোতলা প্রাসাদটি সুদৃশ্য। ১৯০৬ সালে নির্মিত। অন্য নাম ওয়াসিফ মঞ্জিল। নবাব বাহাদুরের বাসস্থান। বর্তমানে নিচের তলায় মুর্শিদাবাদ এস্টেটের অফিস। দোতলায় কিছু কিছু শিল্পদ্রব্য সংর(ত।

কেল্লার দ(ণ দরওয়াজা থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার দূরে পাঁচরাহার মোড়ে হুমায়ুন জাঁর তৈরি আস্তাবল। হাতি, ঘোড়া, উট থাকত এখানে। তা ছাড়া ছিল ঘোড়ার গাড়ি ও মাহুতদের বাসগৃহ। দোতলার ঘরগুলিতে অফিস ও হাতি কোচোয়ানদের বাসগৃহ। দোতলা আস্তাবলের সঙ্গেই ছিল দীঘি, বাগান ও বিশাল মাঠ। সমস্তই উঁচু প্রাচীরে ঘেরা।

কাটরা মসজিদ ঃ হাজারদুয়ারী প্রাসাদের প্রায় ৩ কিমি পূর্বে বহরমপুর - লালগোলা রাস্তার ধারে মুর্শিদকুলি খানের তৈরি মসজিদ ও সমাধিস্থান। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে হেজেস্ কাটরা মসজিদকে ইসলামী শি(ার পীঠস্থান বলে বর্ণনা করেন। ১৭০ বর্গফুট পরিমিত একটি চত্বরে মসজিদ। ১০ ফুট উঁচু ভিত। মসজিদে ওঠার সিঁড়ির নিচে একটি প্রকোষ্ঠে মুর্শিদকুলির সমাধি। বহু পূণ্যাত্মার পদধূলিতে তিনি ধন্য হবেন এমন একটি মনোভাব তাঁর ছিল। পূর্ণচন্দ্র মজুমদার তাঁর 'মসনদ অব মুর্শিদাবাদ ' - এ লিখেছেন, 'কবরের ওপর সবুজ সিল্কের চাঁদোয়া টাঙান, কবরটি সাদা চাদরে ঢাকা, কখনো কখনো তাতে ফুল ছড়ান

থাকে, মালা সাজান থাকে।' এখন চাঁদোয়াও নাই, সাদা চাদরও নাই। সিঁড়ি বেয়ে উঠে খোলা আঙিনায় প্রবেশ পথের ওপর দোতলা তোরণদ্বার, ৪০ ফুট লম্বা, ২০ ফুট উঁচু তোরণের দুপাশে পাঁচটি পাঁচটি করে খিলান। উপর তলায় নহবৎ খানা। প্রধান প্রবেশদ্বার থেকে খোলা আঙিনা পেরিয়ে একটা পাথর বাঁধান রাস্তা সোজা গেছে মসজিদের মাঝখানকার প্রধান দরজা পর্যন্ত। আঙিনাটির দৈর্ঘ্য ১৬৬ ফুট, প্রস্থ ১১০ ফুট।

খোলা আঙিনার পশ্চিমের ধারে ১৪০ ফুট x ২৫ ফুট x ৫০ ফুট । মসজিদের ওপর পাঁচটি বড় বড় গোল গম্বুজ। উত্তর ও দ(িণ দুই প্রান্তে দুটি গম্বুজ টিকে আছে। বাকী তিনটির মধ্যে দুটি ১৮৯৭ এর ভূমিকম্পে ভেঙেছে, একটি ভেঙেছে বহু পরে। মসজিদের প্রবেশ পথে পাঁচটি কালোপাথরের খিলান যুক্ত(দরজা। মাঝের প্রবেশপথের খিলানের কষ্টিপাথরের ওপর ফার্সী ভাষায় লেখা 'আরবের মহম্মদ উভয় জগতের গৌরব, যে ব্যক্তি(তাঁর পথের ধূলি নেয় তার মাথায় ধূলি বৃষ্টি হোক।' ভিতরে পশ্চিমের দেওয়ালে কালোপাথরের ওপর ফার্সী লিপি ঃ ঈ(ের এক। মহম্মদ তাঁর প্রেরিত মহাপু(ষ। মসজিদের উত্তর পশ্চিমে ও দ(িণ পশ্চিমে দুটি মিনার প্রায় ৭০ ফুট উঁচু, আটকোনা। পরপর ৬৭ টি সিঁড়ি মিনারের চূড়ায় উঠে গেছে। মসজিদ ও চত্বরের চারদিকে অনেকগুলি দোতলা ক(আছে। এদের ছাদ গম্বুজের আকারের। প্রতিটি ক(২০ ফুট বর্গ পরিমিত। বহু ক(ভেঙে গেছে। সামনের দুটি মিনারই ভূমিকম্পে ভেঙে পড়ে। কোরান পাঠকারীদের ঘরগুলির অনেকগুলিই তখন ভেঙে যায়।

১৩৩৭ হিজরি বা ১৭২৩-২৪ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি খানের এক বি(স্ত কর্মচারী মুরাদ ফরাস মাত্র এক বছরে মসজিদ নির্মাণ শেষ করেন।

বর্তমানে ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক সর্বে(ণ কাটরা মসজিদের র(ণাবে(ণের দায়িত্ব নিয়েছে। সেজন্য মসজিদ যেমন পরিষ্কার তেমনি মসজিদের চারদিককার সীমানাও পরিচ্ছন্ন , সবুজ ঘাসে ও ফুলগাছে মনোরম।

তোপখানা ঃ কাটরা মসজিদ থেকে প্রায় ১½ কিমি দ(িণ পূর্বে তোপখানা গ্রাম। এখানে নবাবের তোপ বা কামান এবং গোলাবা(দ থাকত বলে নাম তোপখানা। এটাই ছিল পূর্বদিক দিয়ে রাজধানীতে প্রবেশের পথ। তোপখানার পূর্বদিকে গোবরানালা রাজধানীর প্রাকৃতিক প্রতিরোধ হিসাবে কাজ করত। এখান থেকে যুদ্ধের জন্য কামান ও গোলাবা(দ সরবরাহ করা হ'ত।

এখানে জাহানকোষা নামে বিখ্যাত কামান আছে। কামানটি সাড়ে সতেরো ফুট লম্বা। ওজন ২১২ মন বা আনুমানিক ৮ টন। ৩০ কিলোগ্রাম বা(দ লাগে একবার গোলা ছুড়তে। একটা ফলক লিপি থেকে জানতে পারা যায় যে, শাহাজাহানের রাজত্বকাল ১৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে দারোগা শের মহম্মদের নির্দেশ অনুসারে, হরবল্লভ দাসের তত্ত্বাবধানে ঢাকার বাঙালী কারিগর জনার্দন কর্মকার কামানটি তৈরি করেন। বাংলার সুবাদার তখন ইসলাম খাঁ।

রেলস্টেশনের অদূরে নবাব সরফরাজের সমাধি। তাঁর প্রাসাদও ছিল এখানে। ইনিই একমাত্র নবাব যিনি যুদ্ধ (ে ত্রে বীরের মৃত্যুবরণ করেন। সরফরাজের সমাধিস্থানের কাছাকাছি তাঁর বেগমের তৈরি মসজিদ নাগিনাবাগের রাস্তা থেকে দেখা যায়। মসজিদটিকে বলে বেগম মসজিদ। তোপখানা থেকে কিছুটা দ(িণে কদম শরিফ বড় রাস্তার ধারে। এখানে আছে মসজিদ ও ইমামবাড়া। গৌড় থেকে এখানে আনা হয় একটি পাথরের ফলক যাতে পয়গম্বর হজরৎ মহম্মদের পায়ের ছাপ আঁকা। পরে তা আবার গৌড়ের কদমরসুল-এ ফেরত দেওয়া হয়। মীরজাফরের নবাব নাজিমীর ইতোয়ার আলি খান কদম শরিফ স্থাপন করেন ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে। নবাব নাজিমের খোজা বসন্ত আলি খান এই মসজিদের সর্বপ্রথম মুতোয়ালি হন। তিনি তাঁর বিপুল সম্পত্তির অধিকাংশ এই মসজিদে দান করেন। বসন্ত আলির সমাধি এখানেই দেওয়া হয়। মসজিদ ছোট, সুন্দর, সুর(িত। কদম শরিফের প্রবেশ পথে একটি তোরণ, উপরে নবহৎখানা। এককালে এই তোরণ ও নবহৎখানা অতি সুদৃশ্য ছিল। দীর্ঘ দিন মেরামতির অভাবে জীর্ণ ও ভগ্ন অবস্থায়।

কদম শরিফ মসজিদ থেকে দ(িণদিকে গেলে বর্তমান বি. এস. এফ্ ক্যাম্পের পিছন দিকে হুমায়ুন মঞ্জিল। এখানে একদিন ফৌজদারি ও দেওয়ানি আদালত ছিল। নবাব হুমায়ূন জাঁ সুন্দর বাংলো বাড়ি তৈরী করিয়েছিলেন, এখন সে সব বোঝার কোন উপায় নেই। অতীতের সা(্য হিসাবে এই গ্রামের উত্তর ও দ(িণ প্রান্তে সিপাই -এর পাহারা দেওয়ার জন্য কয়েকটি গুমটি ঘরের চিহ্(পাওয়া যায়। হস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলের একটি ভাঙা দালানও আছে, যেখানে একসময় পলু পোকার চাষ হ'ত। হুমায়ুন জাঁর তৈরি লাল বাংলোর খোলা চত্বরে অনাদরে অবহেলায় পড়ে থাকত বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব নাজিমদের পাথরের সিংহাসন। এই সিংহাসনটি এখন কলকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল মিউজিয়মে স্থান পেয়েছে।

কুমারপাড়া ঃ বি. এস. এফ্ ক্যাম্প থেকে কিছুটা দ(িণে গিয়ে পশ্চিম দিকের রাস্তা ধরে কিছুটা পথ যাওয়ার পর রেললাইন পেরিয়ে কুমারপাড়ায় রাধামাধব মন্দিরে পৌঁছান যায়। মতিঝিলের পূর্বতীরে

মনোরম শান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ। ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবনের শ্রীজীব গোস্বামীর সা(াৎ শিষ্য হরিপ্রিয়ার শিষ্য বংশীবদন গোস্বামী বৃন্দাবন থেকে কষ্টিপাথরের রাধামাধব মূর্তি এনে এখানকার মাধবীকুঞ্জে স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে মন্দির তৈরি করে সেখানে রাধামাধব মূর্তি স্থাপন করা হয়। এখানকার স্নানযাত্রা প্রসিদ্ধ উৎসব। মন্দিরের উত্তরদিকে একটি দোতলা গোলাকার স্নান মন্ডপ আছে। এখানেই রাধামাধবকে স্নানযাত্রার দিন স্নান করান হয়।

মতিঝিল ঃ লালবাগে সিংঘী উচ্চ বিদ্যালয়ের পূর্বদিকের রাস্তা মতিঝিল রোড মতিঝিল গিয়ে পৌঁছেছে। ঢাকার নবাব নওয়াজেস মহম্মদ খান ১৭৫০ সালে এখানে ঝিলের পূর্ব প্রান্তের বাঁকে রাধামাধব তলার বিপরীতে সাঙ্গী দালান নামে একটি তিনতলা পাথরের দালান তৈরী করেন। গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ থেকে দালান তৈরীর মালমশলা আসে। ঝিলের পশ্চিমপ্রান্তে একটি তিন গম্বুজের মসজিদও তিনি তৈরী করেন। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ঝিলের উত্তর প্রান্তে মীরজাফর একটি বারদুয়ারী তৈরী করেন। এছাড়া ঝিল মহালসেরা, কাছারি বাড়ি ও অন্যান্য বাসস্থান। ঝিলটি আসলে ভাগীরথীর পুরোনো খাত। এ অঞ্চলে ভাগীরথী বহুবার গতিপথ বদলিয়েছে এবং সেগুলি অনেক(ত্রে ঝিল হিসাবে থেকে গেছে। পশ্চিমদিকে মতিঝিলে ঢোকার গেটের চিহ্(এখনো আছে। একসময় এর দোতলায় নহবৎখানা ছিল। এই মতিঝিলে নবাবী আমলে অতি গু(ত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা ঘটেছে। সিরাজ এখানে সেনাবাহিনী নিয়ে এসে মাসি ঘসেটিকে (মেহেরউন্নিসা) বন্দী করে নিয়ে যান। ঘসেটি এখানে সিরাজের সর্বনাশের জন্য দিনের পর দিন বিরোধীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতেন। এখানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর এজেন্টরা প্রায় ১০০ বছর ধরে আরামে বিলাসে কাটিয়েছে। লর্ড ক্লাইভ এখানে দেওয়ানি লাভের পর পুণ্যাহ অনুষ্ঠান করেছেন। কালত্র(মে মতিঝিলের নাম হ'ল কোম্পানী বাগ। মতিঝিল এখন শ্রীহীন, নাই তার বারদুয়ারী, নাই তার সাঙ্গী দালান।

নসীপুর ঃ ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রাজস্ব বিভাগের দেওয়ান দেবী সিংহের উত্তরপু(ষ রাজা কীর্তিচাঁদ বাহাদুরের তৈরী দোতলা প্রাসাদটি নসীপুরের প্রধান আকর্ষণ। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তৈরী এই প্রাসাদ। হাজারদুয়ারীর মিউজিয়ামের মতই গথিক রীতিতে তৈরী। প্রাসাদের সম্মুখভাগে দোতলায় ওঠার প্রশস্ত সিঁড়িগুলি দেখার মত। প্রাসাদ সংলগ্ন ঠাকুরবাড়িতে প্রধান মন্দিরটি গৃহদেবতা রামচন্দ্রের। চতুষ্কোণ ঠাকুরবাড়ির এক একটি ঘরে এক এক দেবতার অধিষ্ঠান। এই ঠাকুরবাড়ির স্থাপত্যগত বৈশিষ্ট্য কিছু নাই। রাজবাড়ির বাইরের একটি মন্দিরে নিমকাঠের গৌরনিতাই মূর্তি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই রাজবাড়ির একটি শোলার মডেল সেকালের বিখ্যাত সাগর মিস্ত্রি তৈরী করেন। রাজবাড়ির কাছেই রাস্তার ওপর একটি তোরণ, উপরে নহবৎখানা।

নসীপুর রাজবাড়ির কাছে নসীপুরের আখড়া। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে মোহান্ত লোচনদাস এই আখড়া নির্মাণ করেন। তিনি রামানুজ মতাবলম্বী 'বড়গল' সম্প্রদায়ভুক্ত(এবং তাঁর আদিবাস ছিল রাজপুতনার জয়পুর। আখড়া অনেকটা দূর্গের মত। প্রবেশ পথের বাঁদিকে দোতলা কাছারি বাড়ি। তার উপরতলায় দেওয়ালের গায়ে পলাশী যুদ্ধের লড়াইয়ের দৃশ্য। মূল মন্দিরটি রাধামাধবের। এর উত্তর ও দ(ণের মন্দিরে পূজিত হন লক্ষ্মীনারায়ণ ও অন্যান্য দেবদেবীর রত্নমন্ডিত বিগ্রহ। একসময় এই আখড়ার প্রচুর ভূ-সম্পত্তি ছিল যার বেশীরভাগ বর্তমান বাংলাদেশে থাকায় আখড়ার আয় অত্যন্ত কমে গেছে। দেবদেবী মূর্তির প্রচুর রত্ন - অলংকার আছে। ঝুলনের সময় মূর্তি গুলি সাড়ম্বরে সাজান হয়। ঝুলন, রথযাত্রা, দোল প্রভৃতি বৈষ(ব উৎসব আনন্দের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। মহান্ত সব সময় চিরকুমার থাকেন।

নসীপুর রাজবাড়ির পূর্বদিকে কিছুটা দূরে কাঠগোলার বাগান। প্রাসাদ, বাগান ও মন্দির এই তিনটে মিলে কাঠগোলার বাগান। এখানকার রাস্তার দুধারে ছিল কাঠের গোলা। তার থেকে নাম কাঠগোলা। জিয়াগঞ্জের বিখ্যাত ধনী জৈন ধনপৎ সিং দুগর ও ইন্দ্র কুমার দুগর ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি এই বাগানবাড়ি স্থাপন করেন। সামনের প্রবেশ পথটি একটি সুন্দর তিনতলা তোরণ যা নহবৎখানা যুক্ত(। গেট থেকে একটা বড় আঙিনা পেরিয়ে চারতলা প্রাসাদ আধুনিক পাশ্চাত্ত্য রীতিতে তৈরি ও সেইভাবে সাজান। শ্বেত পাথরের মূর্তিগুলি বহুদিন হ'ল বাগান থেকে অন্তর্হিত। ভেতরের সূক্ষ্ম পঙ্খের কাজের জন্য আদিনাথের মন্দিরের খ্যাতি। মন্দিরের ভেতর জৈন তীর্থঙ্করদের মূর্তি।

মহিমাপুরে জগৎশেঠদের বাগান, বাড়ি, মন্দির, টাকশাল, কাছারি বাড়ি প্রভৃতি ছিল। সেগুলি বর্তমানে নিশ্চিহ্(, ভাগীরথীগর্ভে।

জাফরাগঞ্জ ঃ জাফরাগঞ্জ দেউড়ি বর্তমানে জীর্ণ ও ভগ্ন। এই দেউড়ির একটি কক্ষে সিরাজ নিহত হন। এখানেই পলাশী যুদ্ধের পূর্বে মীরজাফরের সঙ্গে ওয়াটসের শেষ চুক্তি(সম্পাদন হয়। পূর্বে প্রবেশ পথে নহবৎখানা যুক্ত(তোরণের দুপাশে দুটি কামান পাতা ছিল, এখন সেটি রওসনবাগে বি. এস. এফ্ ক্যাম্পের প্রবেশ পথে সাজান। লর্ড কার্জন এই দেউড়ি দর্শন করেছিলেন ১৯০২ সালে। বহু বিখ্যাত ব্যক্তি(এই ঐতিহাসিক স্থান দেখতে আসেন। নবাব আলীবর্দী তাঁর সৎ বোন শাহ্ খানমের সঙ্গে মীরজাফরের বিয়ের যৌতুক হিসেবে এটি দান করেন। মুর্শিদাবাদের মসনদে বসার আগে মীরজাফর এই প্রাসাদেই

কাটিয়েছেন। তারপর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মীরণ এই প্রাসাদে ছিলেন।

এর কাছেই জাফরাগঞ্জ মকবারা বা সমাধি(ত্রে মীরজাফর ও তাঁর বংশধরদের সমাধি(ত্র। মীরজাফরের পিতা মহম্মদ নজাফি ও বেগম শাহ্ খানম্ থেকে শু(করে তাঁর বংশধরদের এখানেই সমাধি দেওয়া হয়েছে। মুন্নি বেগম ও বব্বু বেগমের সমাধিও এখানে। সমাধি(ত্রে ঢুকতেই নবাব নাজিমদের সমাধি। শেষ নবাব নাজিম ফেরাদুন জাঁর মরদেহ প্রথমে এখানে সমাধি দেওয়া হলেও পরে ইরাকের কারবালায় নিয়ে গিয়ে পুনরায় সমাধি দেওয়া হয়।

মহিমাপুর ফাঁড়ির একেবারে সামনে আজিমনগর সমাধি স্থান। মুর্শিদকুলি খানের কন্যা আজিমউন্নিসার সমাধির ওপর সিঁড়ি দিয়ে মসজিদ চত্বরে যেতে হয়, ঠিক যেমন মুর্শিদকুলির সমাধির ওপর সিঁড়ি দিয়ে হেঁটে যেতে হয়। আজিমউন্নিসা ধর্মপরায়ণা বেগম ছিলেন। মসজিদের খিলানের একটি অংশমাত্র দাঁড়িয়ে আছে। তাতে পঙ্খের কাজ অসাধারণ। সামনে খোলা চত্বরটি ছাড়া প্রায় সমস্ত মসজিদটিই ভাগীরথীর গর্ভে বিলীন। আজিমউন্নিসা তাঁর জীবদ্দশাতেই এই মসজিদ ও সমাধিস্থান তৈরি করেন ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে।

বিলাসী নবাব সুজাউদ্দিন নির্মাণ করেন তিন তোরণ যুক্ত(ত্রিপোলিয়া গেট ও নহবৎখানা। ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক সর্বে(ণ সম্প্রতি ত্রিপোলিয়া গেটের দায়িত্ব নেওয়ায় তা ধ্বংসের হাত থেকে র(া পাবে। এছাড়া কাছেই আছে আরও তিনটি বিশাল আকারের তোরণ। পুরোনো বাংলা ইঁটের গাঁথনি। চারটি বিশাল গেট দিয়ে ঘেরা এই জায়গাটাই চাঁদনি চক, যেখানে আমীর ওমরাহ্রা হীরে জহরৎ কিনতেন, এমনকি দাসদাসীও কেনাবেচা হত।

ত্রিপোলিয়া গেটের সামান্য উত্তরে রাস্তার ধারে মুর্শিদকুলি খানের বেগম নৌসেরি বানুর সমাধি (১৭৩১ খ্রীঃ অব্দ) ও মসজিদ অনাদৃত অবস্থায় বর্তমান।

চাঁদনি চকে নিজামত কেল্লার প্রাচীর ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে সাত গম্বুজওয়ালা চক মসজিদ। এটি মুন্নিবেগম তৈরি করিয়েছিলেন ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ বীনাবাদক ওয়াজিদ খানের স্মৃতির সম্মানে। মসজিদের পাশেই ওয়াজিদের সমাধি। এই জায়গাতেই ছিল মুর্শিদকুলি খানের চেহেল সেতুন।

চকবাজার থেকে দ(ণদিকের রাস্তায় কিছুটা গেলেই ডানদিকে রওণক অবজা গেট।

এই পথেই নিজামত কেল্লার প্রধান প্রবেশপথ 'দ(ণ দরওয়াজা' একটা বিশাল দোতলা তোরণ যার উপরতলায় নহবৎখানা।

মুর্শিদাবাদ শহরের এই সমস্ত গেট বা দরজার ওপর বেশির ভাগ (ত্রেই নহবৎখানা ছিল। নহবৎ খানায় যে সুর বাজত তা ছিল মোগল সম্রাটের অনুমোদিত।

যুগ(রা ঃ বড়এ(া থেকে চার কিলোমিটার পশ্চিমে যুগ(রা (চলিত নাম যুগসরা) যোগে(রের শিবমন্দিরের জন্য প্রসিদ্ধ। উত্তর প্রদেশ থেকে আগত নায়ক উপাধিধারী (জমিদারদের পূর্বপু(ষ হাটুরাম তেওয়ারী নবাব আলীবর্দীর কাছ থেকে জমিদারী লাভ করে এই গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তাঁদের সঙ্গে বহিরাগত আরও অনেকে এখানে এসে স্থায়ীভাবে বাস করেন। গ্রামে প্রাচীন ও আধুনিককালের অনেকগুলি মন্দির আছে। নায়কদের বসতবাড়ীর মধ্যে ১২৮৫ বঙ্গাব্দে (১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে) নির্মিত 'ঠাকুর দালানে' জগদ্ধাত্রী ও অন্যান্য পূজা হয়। পত্রাকৃতি পাঁচটি খিলানযুক্ত(গোলাকার স্তম্ভগুচ্ছের এই বৃহৎ দালানমন্দিরটিতে পঙ্খের সুন্দর কা(কার্য আছে। নিকটেই আরও কয়েকটি ধ্বংসোন্মুখ মন্দির বর্তমান।

গ্রামের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে 'শিবালয়'। একটি অতি প্রশস্ত প্রাচীর-ঘেরা অঙ্গনের পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিম দিকে বিভিন্ন সময়ে নির্মিত বিভিন্ন স্থাপত্যের মোট ১২টি মন্দির আছে। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে সাড়ে চার মিটার ও উচ্চতায় সাড়ে দশ মিটার দ(ণমুখী চারচালা মূল মন্দিরটি ১ মিটার উঁচু ভিত্তির উপর স্থাপিত। মন্দিরের পূর্ব দিকে আর একটি দরজা আছে। ভিতরে অনেকটা নিচে অনাদি লিঙ্গ যোগে(র। মন্দিরটি বীরভূমের ঢেকার রাজা রামজীবন রায় (মুর্শিদকুলি খাঁর সমসাময়িক) কর্তৃক স্থাপিত। ১৬৯৬ শকাব্দে (১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে) মন্দিরের একবার সংস্কার হয়। এই মন্দিরের পশ্চিমে প্রায় সাড়ে চার মিটার দৈর্ঘ্যের বর্গাকৃতি আর একটি সুন্দর চারচালা মন্দির আছে। এই মন্দিরের সম্মুখের দেওয়ালে উন্নত মানের পোড়ামাটির অলঙ্করণ আছে। মন্দিরটি সতের শতকে গ্রামের তৎকালীন সমৃদ্ধশালী পাঠক-পরিবারের নির্মিত। কিছুদিন আগে পুরাতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক মন্দিরের সংস্কার করা হয়েছে। প্রাঙ্গণের পূর্বদিকে দুবে-পরিবারের নির্মিত তিনটি চারচালা মন্দির। উত্তর-পূর্বদিকের চারটি চারচালা মন্দির নায়কদের নির্মিত। এগুলি কিছুটা পরবর্তী কালে ঊনিশ শতকে নির্মিত।

পশ্চিমদিকের তিনটি মন্দিরের মধ্যেরটি মুর্শিদাবাদে বহুল প্রচলিত রীতির পঞ্চরত্ন মন্দির (বহু কার্ণিশযুক্ত(স্ফীতকায় মূল চূড়া ও চারদিকে তুলনায় অতি(দ্র চারটি চূড়া)। সমগ্র এলাকাটি রাজ্য সরকার কর্তৃক সংর(ত।

গ্রামের প্রবেশপথে একটি (দ্র নদীর তীরে নায়কদের কয়েকটি সুদৃশ্য সমাধি মন্দির আছে।

রাঙামাটি (কর্ণসুবর্ণ) ঃ বহরমপুর থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার দ(ণে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে রাঙামাটি বা অতীতের কর্ণসুবর্ণ অঞ্চল। কর্ণসুবর্ণ নতুন করে আবিষ্কারের ফলে অঞ্চলটি আবার কর্ণসুবর্ণ নামে অভিহিত হচ্ছে। বহরমপুর থানার অন্তর্গত এই অঞ্চলটি প্রায় ১৮ বর্গ-কিলোমিটার বিস্তৃত। যদুপুর, রাঙামাটি - চাঁদপাড়া, মধুপুর, সংস্কার প্রভৃতি কয়েকটি গ্রাম নিয়ে এই অঞ্চল। বলা বাহুল্য কর্ণসুবর্ণ নগর আরও বিস্তৃত ছিল। পুরনো কর্ণসুবর্ণের এক বিরাট অংশই এখন ভাগীরথী-গর্ভে বিলুপ্ত।

কর্ণসুবর্ণ প্রাচীন বাংলার একটি গু(ত্বপূর্ণ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নগর। সপ্তম শতাব্দীতে প্রখ্যাত চৈনিক তীর্থযাত্রী ও পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ বা নামান্তরে য়ুয়ান-চোয়াং এই নগরী ও তার উপকণ্ঠে রক্ত(মৃত্তিকা মহাবিহারের কথা লিখে গিয়েছেন। তাঁর বিবরণী থেকেই কর্ণসুবর্ণ নগরীর কথা সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়। এই নগর সেই সময়ের অতি সমৃদ্ধ ও পরাত্র(মশালী গৌড়রাজ্যের রাজা শশাঙ্কের রাজধানী ছিল। মহারাজ শশাঙ্কের মৃত্যুর পর কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার 'নিধনপুর' এবং জয়নাগের 'বপ্পঘোষবাট তাম্রশাসন' থেকেও কর্ণসুবর্ণ নগরীর কথা জানা যায়।

১৯৬২ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বি(েবিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তৎকালীন প্রধান অধ্যাপক ড. সুধীররঞ্জন দাস মহাশয়ের পরিচালনায় খননকার্যের ফলে এই নগরী ও তৎসংলগ্ন রক্ত(মৃত্তিকা মহাবিহারের অবস্থান সুনিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। ১৯৬২-এর আগে ও পরে কয়েকবার এই স্থানে উৎখনন হয়েছে এবং খ্রীষ্টিয় দ্বিতীয়/তৃতীয় শতাব্দী থেকে দ্বাদশ/ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময়ের বহু অজ্ঞাত তথ্য ও নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।

হিউয়েন সাঙ এর বিবরণ অনুসারে এই নগরের পরিধি ছিল ২০ লি অর্থাৎ সাত মাইল। কিন্তু নগরের এক বিশাল অংশ, এমন কি প্রধান অংশ- ভাগীরথীর গর্ভে বিলুপ্ত হলেও মূল রক্ত(মৃত্তিকা বিহার ও তার চারদিকে যে বিস্তৃত অঞ্চল ছড়িয়ে আছে সেগুলিও এককালে কর্ণসুবর্ণের অংশ ছিল। এখনও অনেকগুলি গ্রামে তার কিছু কিছু নিদর্শন দেখা যায়। ১৮৪৪ সাল থেকে দেড়শ বছরেরও বেশী সময় ধরে এই অঞ্চলে অনুসন্ধান চলছে। লেয়ার্ড, বিভারিজ, নিখিলনাথ রায় প্রভৃতি যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তি(এখানে অনুসন্ধান চালিয়ে গিয়েছেন তাঁদের বিবরণে উল্লিখিত বহু নিদর্শনই এখন লুপ্ত। এমনকি ডঃ দাসের সময়েও যে সকল নিদর্শন দেখা যেত সেগুলিরও অধিকাংশই এখন দেখা যায় না। গ্রামগুলিতে ত্র(মবর্ধমান জনবসতি এবং সেই জন্য কৃষিকার্যের ব্যাপকতার ফলে বহু পতিত জমি এবং ডাঙ্গা (উচ্চভূমি বা ঢিপি) এখন আবাদ হচ্ছে। তার ফলে মাটির উপরের এবং নিচের বহু মূল্যবান ঐতিহাসিক নিদর্শন অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। মাত্র কয়েক বছর আগেও যে সকল নিদর্শন দেখা যেত এখন তার অনেকগুলিই লুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

যদুপুর গ্রামের পশ্চিম দিকে রাজবাড়ী ডাঙ্গাতে ছিল রক্ত(মৃত্তিকা মহাবিহার। রাজবাড়ীডাঙ্গায় খনন কার্যের ফলে চারটি স্তরে মোট পাঁচটি পর্বের বসতির চিহ্(পাওয়া গিয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের বসতি চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বেকার সময়ের। প্রথম পর্বের বসতি ভাগীরথীর প-াবনে নষ্ট হয়ে যায়। দ্বিতীয় পর্বে পাওয়া যায় দেওয়ালের নীচে প্রোথিত একটি নরমুন্ড। তৃতীয় পর্বে এক বৌদ্ধবিহারের মেঝে ও সিঁড়ি এবং গোলাকার স্তূপের ভিত্তি পাওয়া গিয়েছে। ঐ পর্বেই পাওয়া যায় একটি দগ্ধ শস্যভান্ডার। অষ্টম নবম শতাব্দীতে এই শস্য ভান্ডার অগ্নিদগ্ধ হয়। তৃতীয় পর্বে ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীর একটি বিশাল পঞ্চায়তন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দের খননকার্যে বিহারের সীমার মধ্যে তৃতীয় চতুর্থ শতাব্দীর এক বি(েবিদ্যালয় ভবনের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। বিভিন্ন স্তরে বসতি ছাড়াও আবিষ্কৃত হয়েছে হাতে তৈরী ও ছাঁচে ঢালা পোড়া মাটির মূর্তি, চুনবালির তৈরী মূর্তির মুখ, সপ্তম - অষ্টম শতাব্দীর তাম্রনির্মিত ধর্মচত্র(, অষ্টম - নবম শতাব্দীর ব্রোঞ্জ নির্মিত বুদ্ধ ও গণেশের মূর্তি প্রভৃতি। সবচেয়ে গু(ত্বপূর্ণ আবিষ্কার পোড়া মাটির অজস্র সীলমোহর। এগুলি ষষ্ঠ থেকে অষ্টম - নবম শতাব্দীর সময়কালের। এগুলিতে উৎকীর্ণলিপির অধিকাংশই রক্ত(মৃত্তিকা ভি(সংঘের কার্য সমন্বিত। এই সীলমোহরগুলি থেকেই সুনিশ্চিত ভাবে রক্ত(মৃত্তিকা মহাবিহারের অবস্থান নির্ণীত হয়েছে।

মধ্যযুগ থেকেই কর্ণ সুবর্ণ অঞ্চলটি 'রাঙামাটি' নামে পরিচিত হয়। এখানকার মাটির রঙ লাল হওয়ার জন্যই এই নাম। (রক্ত(মৃত্তিকা নামও একই কারণে)। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই 'রাঙামাটি'র উল্লেখ পাওয়া যায়। নবাবী আমলে বাংলার দশটি ফৌজদারী বিভাগের অন্যতম ছিল রাঙামাটি।

পলাশীর যুদ্ধের পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এখানে একটি সেনানিবাস স্থাপন করতে চেয়েছিল। কিন্তু কলকাতার সঙ্গে সড়কপথে সরাসরি যোগাযোগ না থাকায় এই পরিকল্পনা রূপায়িত হয়নি। ইংরেজ আমলের সূত্রপাতের সময় রাঙামাটির জমিদার রীতিমত বিখ্যাত ছিলেন। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে মতিঝিলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম পুণ্যাহের সময় এখানকার জমিদার নদীয়ার মহারাজার সমান 'খেলাত' বা মর্যাদা লাভ করেছিলেন। কোম্পানীর আমলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাঙামাটিতে একটি বিশাল রেশম কুঠী স্থাপন করে। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে এই কুঠী বেঙ্গল সিল্ক কোম্পানী কিনে নেয়। ১৯১২ সালে এই কুঠী আসে সাটুই গ্রামের চট্টরাজদের হাতে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই

রেশম শিল্পে ভয়ানক মন্দা নেমে আসায় অন্যান্য অনেক কুঠীর মত এই কুঠীও বন্ধ হয়ে যায়। এখানে সেই আমলের ইংরেজদের কয়েকটি সমাধি ছিল। এখন সেগুলির চিহ্(মাত্রও নাই। একমাত্র চিমনিটি ছাড়া রেশম কুঠীরও কোন চিহ্(অবশিষ্ট নাই। এখন কুঠীর বিশাল এলাকায় চাষ-বাস হচ্ছে।

১৯৪৭-এ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অন্যান্য স্থানের মতই রাঙামাটি অঞ্চলেও কিছু পরিবর্তন এসেছে। খননকার্যের ফলে প্রমাণিত হয়েছে রাঙামাটিই অতীতের কর্ণসুবর্ণ। রাঙামাটি আবার পরিচিত হয়েছে কর্ণসুবর্ণ নামে, চি(টি স্টেশনের নাম হয়েছে কর্ণসুবর্ণ স্টেশন। মধুপুরে স্থাপিত হয়েছে 'রাজা শশাঙ্ক বিদ্যাপীঠ' ও হাসপাতাল। পাশেই চর মহুলায় স্থাপিত হয়েছে আধুনিক রেশম উৎপাদন কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগ কর্তৃক রাজবাড়ী ডাঙ্গা সংর(ণের ব্যবস্থা হয়েছে।

লালগোলা ঃ ঐতিহাসিক জেলা মুর্শিদাবাদে। মনোহর মন্দিরময় লালগোলা। পশ্চিমে ভাগীরথী উত্তরে পদ্মা ও কলকলি, পূর্বে ভৈরব ও ছোট পদ্মা নদী। পূর্বপ্রান্তে পদ্মার ওপারে রাজশাহী। নদীর নির্জন তীরে রয়েছে বহু সাধকের সাধন স্থান।

লালগোলা রাজপরিবার ঃ অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিকে উত্তর প্রদেশের গাজীপুর জেলার পার্সী গ্রাম থেকে লালগোলা রাজ বংশের প্রথম পু(ষ মহিমাচরণ রায় ভাগ্যের অন্বেষণে লালগোলা সংলগ্ন পদ্মার পূর্বদিকে অবস্থিত রাজশাহী জেলার সুন্দরপুর গ্রামে এসে বাসা বাঁধেন। পদ্মার গ্রাসে সুন্দরপুর গ্রাম ধ্বংস হলে তাঁর পুত্রদ্বয় দলেল রায় ও রাজনাথ রায় অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে কলকলি নদী সংলগ্ন গভীর বনভূমির কিছু অংশ পরিস্কার করে বসতি স্থাপন করেন। স্থানটির নাম হয় শ্রীমন্তপুর।

দলেল রায় ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে নবাব দরবারের জিলাদারী কার্য এবং ১৭৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দে রাণী ভবানী এস্টেটে সৈন্য দলের সেনাপতির কার্য করেন। বেশ কিছু ভূসম্পত্তি ত্র(য় করে তিনি নীল, রেশম ও ধানের আড়ৎ এর ব্যবসা করেন। ঐগুলি দলেল রায়ের গোলা। অপভ্রংশে লাল রায়ের গোলা নামে পরিচিত ছিল। ত্র(মে ত্র(মে এ অঞ্চলের নাম হয়ে যায় লালগোলা।

দলেল রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নীলকণ্ঠ রায় লালগোলার জমিদার হন। তিনি নবাব দরবার থেকে রাও উপাধি লাভ করেন।

রাও আত্মানারায়ণের মৃত্যুর পর খ্যাতিমান পুত্র রাও রামশঙ্কর রায় লালগোলার জমিদার হন। রাজা রাও রামশঙ্কর রায়ই ছিলেন বর্তমান লালগোলার রূপকার। আনুমানিক ১৮০০ সালে নতুন রাজবাড়ী ও ১৮১৩ সালে রঘুনাথ মন্দির সংস্কার ও নির্মাণ, কালী মন্দির সংস্কার ও নির্মাণ, নাটমন্দির সহ জগদ্ধাত্রী মন্দির, ১৮৩৬ সালে লালগোলা বাজার 'সুদর্শনগঞ্জ' স্থাপন করেন। গৃহ দেবতা ভগবান দধি বামন (বিষু( ) মন্দির, ল্মীবাড়ী নির্মাণ, ১৮২৩ সালে রথযাত্রার প্রচলন করেন। দেব সেবা ও রাজগু(পরিবারের জন্য প্রচুর অর্থ ও দেবোত্তর সম্পত্তি দান করেন।

রাজ রাও রামশঙ্করের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রাও মহেশ নারায়ণ রায় (১৮৩৬-১৮৬১) লালগোলার রাজা হন। তিনিও লালগোলা ও ভগবানগোলায় বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে উত্তর প্রদেশের রাম চরিত্র রায়কে দত্তক রূপে গ্রহণ করেন। ইনিই লালগোলার দানবীর রাজা যোগেন্দ্র নারায়ণ রাও।

মহারাজ রাও যোগেন্দ্র নারায়ণ রাও শি(া, সংস্কৃতি, সাহিত্য, স্বাস্থ্য, দরিদ্র সেবা, ধর্ম ও মন্দির নির্মাণ ও বহু দান করেন।

মহারাজ যোগেন্দ্র নারায়ণ রাও মহাশয়কে তাঁর বিভিন্ন সদ্ গুণের জন্য রাজা, মহারাজা, স্যার, নাইট, সি আই-ই উপাধি প্রদান করা হয়। ১৩৫৩ সালের ১লা ভাদ্র তিনি পরলোক গমন করেন।

যোগেন্দ্র নারায়ণের পুত্র হেমেন্দ্র নারায়ণ রায়ের পুত্র কুমার বাহাদুর ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় লালগোলার শেষ রাজা ছিলেন। তিনি একজন সুসাহিত্যিক বিখ্যাত শিকারী, টেনিস খেলোয়াড় ও সঙ্গীত অনুরাগী ছিলেন। ১৯৬০-৬১ সাল নাগাদ তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায়, রাজা ধীরেন্দ্রনারায়ণের নিকট থেকে লালগোলার ঐতিহ্যসম্পন্ন রাজবাড়ীটি অধিগ্রহণ করেন। এই ঐতিহাসিক রাজবাড়ীটি রাজ্য সরকারের মুক্ত(সংশোধনাগার হিসাবে কারা বিভাগের অধীনে আছে।

লালগোলার দ্রষ্টব্য স্থান সমূহ ঃ দেবী জগদ্ধাত্রী মন্দির লালগোলা রাজের গেষ্ট হাউস সংলগ্ন লক্ষ্মী বাড়ীতে অবস্থিত।

দেবী দশভূজা দুর্গা মন্দির। শৃঙ্খলিতা মহাকালী মন্দিরের পাশে রয়েছে কয়েকটি শিব মন্দির - রানী পুকুরের পাড়ে রয়েছে রাজগু(কালীব্রহ্ম ভট্টাচার্য্যের বিখ্যাত দুর্গা মন্দির।

বিষু(মন্দির - লালগোলা রাজের কূল দেবতা হলেন ভগবান বিষু(, যিনি দধিবামন রূপে পূজিত হতেন। রাজবাড়ীর সিংহ দ্বার পেরিয়ে অন্দর মহলের সর্বোচ্চ তলে ভগ্ন অবস্থায় রয়েছে মন্দিরটি।

রঘুনাথ মন্দির - পূর্বে এই মন্দিরের বৌদ্ধ বিহার- বৌদ্ধ দেবী 'কলকলি' মন্দির ছিল। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পর এই মন্দিরে দিনাজপুর জেলার 'কাঞ্চন মশিদা' মঠের শ্রী শ্রী রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, হনুমানজী, রাধাকৃষ(মূর্ত্তি ও বহু শালগ্রাম এবং শিবলিঙ্গ এই মন্দিরে এনে রাখা

হয়।

এছাড়া রয়েছে নারায়ণ মন্দির, শিবমন্দির, শিব-কালী মন্দির, লক্ষ্মী নারায়ণ মন্দি র, সন্ন্যাসী তপকালী মন্দির, তারামা'র মন্দির, চাকলেশ্বরী মন্দির। এছারা রয়েছে লালগোলা গেষ্ট হাউস, দেওয়ান সড়াই এ মানিক চাঁদের তালাও, বিপ-বীদের গোপন আশ্রয় স্থল এবং ভৈরব নদীর কোলে মহেশনারায়ণের বিখ্যাত দুর্গামন্দির।

শক্তিপুরঃ ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে মুর্শিদাবাদের অন্যতম প্রাচীন ও বিশিষ্ট জনপদ শক্তিপুর। গ্রামটি বহরমপুর মহকুমায়। ভাগীরথীর গর্ভে বিলীন হয়েছে এখানকার বিখ্যাত কপিলেশ্বর শিব মন্দির। বর্তমানের মন্দিরটি প্রায় ৩৫ বছর আগের তৈরী। গ্রামের মাহাতা অংশে অবস্থিত চারচালা মন্দিরটি পুরা সম্পদের দাবী রাখে। উনিশ শতকে এর নির্মাণ। আজও গাজনের বাজনা বাজে নীহারের বটতলায়। পূজা শিবের কিন্তু মূর্তিটি বুদ্ধদেবের।

এককালে বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্য ছিল এই অঞ্চলে। রাজা শশাঙ্কের কর্ণসুবর্ণ এখান থেকে দূরে নয়। দূরে নয় বজ্রাসন বা বাজারসাউ, যা হাওড়া-আজিমগঞ্জ রেলপথের একটি স্টেশন। এখান থেকে সামান্য দূরত্বে রামনগর বহরমপুর সড়কের ধারে এই জনপদ।

রেশম সিল্কের পলুর আবাদ এখানে আজও হয়। কেন্দ্রীয় রেশম গবেষণাগারের একটি খামার ও অফিস এখানে আছে।

সাগরদীঘি ঃ বহরমপুর থেকে প্রায় ৩২ কিলোমিটার উত্তর - পশ্চিমে জঙ্গীপুর মহকুমার অন্তর্গত সাগরদীঘি। ৩৪ নং জাতীয় সড়ক থেকে সুকী গ্রমের ভিতর দিয়ে একটি পাকা সড়ক সাগরদীঘিকে অতিক্রম করে রঘুনাথগঞ্জ পর্যন্ত প্রাসারিত। পূর্ব রেলপথের আজিমগঞ্জ জংশন স্টেশন থেকে প্রায় ১৮ কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে সাগরদীঘি স্টেশন থেকে প্রায় ১৮ কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে সাগরদীঘি স্টেশন। স্টেশন থেকে সামান্য দক্ষিণ-পশ্চিমে অতি বিশাল দীঘি 'সাগরদীঘি'। এই দীঘির নাম অনুসারেই গ্রাম এবং থানার নামও সাগরদীঘি। এই সাগরদীঘি থানার বিস্তৃত অঞ্চলে বিভিন্ন যুগের ইতিহাস ছড়িয়ে আছে। সাগরদীঘি থেকে দশ কিলোমিটার পশ্চিমে 'মহীপালে' প্রায় শতাধিক বৎসর ধরে পালরাজাদের রাজধানী ছিল বলে মনে করা হয়। এই সম্পর্কিত বহু প্রত্নতাত্বিক নিদর্শন 'মহীপাল'এবং তার আশে পাশে পাওয়া যায়।

পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ এই বিশাল দীঘিটির পাড় সমেত দৈর্ঘ্য - প্রায় এক মাইল এবং প্রস্থ প্রায় আধ মাইল। বর্তমানে দীঘিটির চারদিকের অনেক অংশই মজে গিয়েছে এবং স্বাভাবিক ভাবেই তা কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। পূর্ব দিকে সন্তোষ পুরের দিকে দীঘির গর্ভে অনেক জনবসতিও হয়েছে। মাঝখানে এখনও যে জল আছে তার আয়তন ৭২ একর বা ২২০ বিঘা।

সাগরদীঘির উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ে তিনটি করে ছয়টি ও পূর্ব ও পশ্চিম পাড়ে দুটি করে চারটি, মোট দশটি বাঁধান ঘাট ছিল । কিন্তু সেগুলি এখন নাই । দীঘির পূর্ব পাড়ে ইঁটের ভিত্তি সহ কয়েকটি উচুঁ টিপি ও ইতস্তঃ বিক্ষিপ্ত কয়েকটি প্রস্তরমূর্তির ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। সাগরদীঘির পশ্চিমে ব্রাহ্মণী- গ্রামের সেখপাড়ার প্রবেশপথে উত্তর পশ্চিম কোনে প্রায় দুই বিঘা আয়তনের ১৫/২০ ফুট উঁচু একটি বিরাট ঢিপিতে ইটের অনেক ভিত্তি দেখা যায় । ঢিপির পশ্চিম প্রান্তে বনবাড়ি শাহ্ পীরের ভাগিনেয় বুড়া পীরের দরগা দীঘির অপর (পূর্ব) পাড়ে সন্তোষপুরে।

দীঘির ঠিক মাঝখানে একটি বিরাট স্তম্ভ আছে (জয়স্তম্ভ?) জলের তলায় আয়তাকার যে বেদী বা ভিত্তির উপর স্তম্ভটি স্থাপিত সেটির অন্ততঃ দুটি থাক। নীচেরটি বড়, প্রায় ২০ ফুট দীর্ঘ এবং ১৫ ফুট প্রশস্ত। উপরেরটি অপেক্ষাকৃত ছোট। স্তম্ভটি প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় ভাঙ্গা। ভিত্তির উপরের অংশটি অন্তত দশ / বার ফুট উঁচু। তবে গোটা স্তম্ভটি ঠিক কতটা উঁচু ছিল তা আজ জানা সম্ভব নয়। বারবার প্রচন্ড আঘাত করে স্তম্ভটি ভাঙ্গা হয়েছে। নতুবা এমন স্থূল, নীরেট এবং শক্ত পাথরের স্তম্ভ আপনা থেকে ভেঙ্গে যাওয়া সম্ভব নয়। ভাঙ্গা জায়গাটির উপরের এক দিকে সূক্ষ্মাগ্র হয়ে থাকায় এটিকে মন্দিরের চূড়া বলে মনে করা হ'ত। আড়াআড়ি ভাবে ভেঙ্গে যাওযায় স্বভাবিক কারণেই এক দিকের উপরটা সুঁচাল হয়ে গিয়েছে । পাথরের স্তম্ভটি বার কোণ, পরিধি বা বেড় আন্দাজ পনের ফুট।

সাগরদীঘির প্রতিষ্ঠাসংক্রান্ত একটি শিলালিপি ছিল, কিন্তু সেটির হদিস এখন পাওয়া যায় না। লিপিটি নিখিলনাথ রায় সংগ্রহ করে তাঁর মুর্শিদাবাদের ইতিহাস গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। তার প্রথম শ্লোকটি এই রকম-

' শাকে সপ্তদশাব্দীকে স্থিতে সাগরদীর্ঘিকা।
পালবংশকৃতং খাতং ব্রহ্মহা মুক্তি হেতুনা।।'

পালবংশের (রাজার)দ্বারা ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য (খনিত) এই সাগরদীঘি সপ্তদশ শকাব্দে অবস্থিত ছিল। লিপি অনুসারে পালরাজা দীঘি খনন করিয়েছিলেন , কিন্তু তিনি কোন পাল রাজা তা বলে যায়নি। জনশ্রুতি অনুসারে পালসম্রাট মহীপাল দীঘি খনন করান সাগরদীঘির দশ কিলো মিটার পূর্বে মহীপাল নগরে রাজধানী ছিল

বলে মনে করা হয়। কিন্তু লিপির তারিখ (১৭ শকাব্দ বা ৯৫ খ্রীষ্টাব্দ) অনুসারে ঐ সময় কোন পালরাজার অস্তিত্ব ছিল না । তাই অনেকেই ঐ লিপির প্রামাণিকতা স্বীকার করেন না। তবে নিখিলনাথ রায় ঐ তারিখ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করেছেন সেই অনুসারে দীঘির প্রতিষ্ঠাকাল ৭১০ বা ৭৪০ শকাব্দ অর্থাৎ ৭৮৮ বা ৮১৮ খৃষ্টাব্দ যা পালসম্রাট ধর্মপাল (৭৭০-৮১০ খৃষ্টাব্দ) অথবা দেবপালের (৮১০- ৮৫০ খৃষ্টাব্দ) সময়। পালরাজারা রাজ্যের বহু স্থানে বিশাল, বিশাল দীঘি খনন করিয়েছিলেন ।তাঁরা স্তম্ভ নির্মাণও করেছিলেন। দিনাজপুর জেলার 'বাদল'স্তম্ভ এমনই এক স্তম্ভ। ঐ স্তম্ভে পালরাজাদের বিবরণ মূলক লিপিও খোদিত আছে। সাগরদীঘির স্তম্ভের অবশিষ্টাংশ পাওয়া গেলে এবং সেখানে সম্ভাব্য উৎকীর্ণ লিপির সন্ধান পাওয়া গেলে এ বিষয়ে অনেক তথ্যই জানা যেত।

দীর্ঘকাল ধরে সংস্কার না হওয়ায় কালত্র(মে দীঘি অব্যবহার্য হয়ে পড়ে। মুলমান আমলে সাগরদীঘি রাজধানী বা শাসনকেন্দ্র থেকে দুরে পড়ে যায় এবং দীঘির গৌরব লুপ্ত হয়। দীর্ঘকাল এই অবস্থা চলে। ইংরেজ আমলেও সাগদীঘি গু(ত্ব পায়নি। বরং অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ে। ১৯৫১ সালের জেলার আদমশুমারের বিবরণীতে বলা হয়েছে , স্থানীয় লোকে দীঘির জল ব্যবহার করেন না এবং এই দীঘিকে ভয়ের চ(দেখেন। কারণ দীঘির জলে তখন কুমীরের অভাব ছিল না । প্রধান কারণ অবশ্য এই যে দীর্ঘকাল ধরে দীঘির সংস্কার না হওয়ায় দীঘির তীরবর্তীস্থান মজে যায় এবং জল থাকে পাড় থাকে অনেক দূরে । পাঁক, জলজ উদ্ভিদ প্রভৃতি অতিত্র(ম করে সেখানে পৌঁছান প্রায় অসম্ভব ছিল।

তবে দীঘির সংস্কার না হলেও এবং দীঘি ত্র(মশ মজে এলেও বৃটিশ আমলেই সাগরদীঘি - গ্রামের উন্নতি শু(হয়। উনিশ শতকে (১৮৬৩ নলহাটি - আজিমগঞ্জ রেলপথ নির্মিত হলে এবং পরে গিয়াসাবাদ - বদ্রীহাট থেকে থানা সাগরদীঘিতে স্থানান্তরিত হলে এখানকার গু(ত্ব আরও বেড়ে যায়। স্বধীনতা - উত্তর কালে সাগরদীঘি অঞ্চলের দ্রুত উন্নতি হতে থাকে। বহরমপুর ও জঙ্গীপুরের সঙ্গে পাকা রাস্তায় সরাসরি যোগাযোগ, দীঘির উত্তর পাড়ে বালক ও বালিকাদের জন্য পৃথক পৃথক উচ্চ বিদ্যালয় , হাসপাতাল, ব্লক কার্যালয়, দীঘির দ(ণ - পূর্ব দিকে বিদ্যুৎ - সরবরাহ কেন্দ্র প্রভৃতি স্থাপিত হওয়ায় এই স্থান এখন বেশ উন্নত হয়ে উঠেছে। কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যেরও উন্নতি হওয়ায় এই স্থানের সমৃদ্ধিও যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছে। বর্তমানে সাগরদীঘি ও সন্নিহিত পা - পাড়া, সন্তোষপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি সাগরদীঘি নামেই পরিচিত। এই গ্রামগুলির সম্মিলিত জনসংখ্যা প্রায় দশহাজার (১৯৯১ এর জনগণনা অনুসারে)। জায়গাটি এখন বড় গঞ্জ বা আধাশহরের রূপ পরিগ্রহণ করেছে। তবে দীঘির একটি অংশের (উত্তর-পূর্ব-কোণ) উপর দিয়ে রাস্তা হওয়ায় কিছুটা হলেও দীঘির অঙ্গহানি ঘটেছে।

সালার ঃ সালার কান্দী মহকুমার অন্তর্গত একটি বর্ধিষু(জনপদ। কান্দী শহরের দ(ণদিকে এই গ্রামটির অবস্থান। জনসংখ্যা ১৪০৯৬ (১৯৯১), শি(ার হার ৩৫ শতাংশ। কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ ১১.৮০০ হেকটর। থানা সালার। পূর্বে ভরতপুর থানার অন্তর্গত ছিল। ব্লক ভরতপুর-২।

এই গ্রামের নামকরণের ইতিহাস যতদূর জানা যায় তা হ'ল, মোগল আমলে কোন এক 'সিপাহ সালার' এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন সেই থেকে গ্রামের নাম হয়েছে সালার। আবার কেউ বলে শালিবাহন রাজার রাজধানী ছিল এই গ্রাম। সেই থেকে সালার।

সালারের আয়তন ১৭৬৬.৫৫ একর। বর্তমানে গ্রামটি ভাল ব্যবসাকেন্দ্র। হাওড়া থেকে ১৬১ কিমি এবং খাগড়া থেকে ৪১ কিমি দূরত্বে সালার রেলস্টেশনটি অবস্থিত।

গ্রামটির মধ্যভাগে 'দহপুকুর'। এই পুকুর থেকে অনেক দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে বিভিন্ন সময়। কালীকৃষ(দে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে সেগুলি দেখতে পাওয়া যায়। নবাবের দেওয়ান এবং জমিদারদের বাসস্থান আজো রয়েছে। মহরম উপলে(্য মেলা বসে। তাজিয়া, গোমরার আলোক সজ্জা, লাঠিখেলা, মর্সিয়া গানের সুরে গ্রামটি মুখরিত হয়। গ্রামটি মুসলিম প্রধান। তবে হিন্দু, জৈন সম্প্রদায় অল্প হলেও সম্প্রীতি বজায় রেখে বসবাস করে।

সেখের দীঘি ঃ গ্রামের নাম সেখদীঘি। কেউ বলেন সেখেরদীঘি। মৌজা রমনা সেখদীঘি। অবশ্য পূর্বে এই গ্রামের নাম ছিল 'মাসুমাবাদ'। এখানে আছে প্রায় এক কিলোমিটার দৈর্ঘ্য এবং আধ কিলোমিটার প্রস্থের (প্রায় সাগরদীঘি বা মহেশাইল দীঘির মতো) বিশাল দীঘি। এই দীঘির উত্তর পাড়ের গ্রাম অনুপপুর। দ(ণপাড়ের বসতি হাজীপুর। উত্তর-পশ্চিম বসতি সেখদীঘি-মিএ(াপাড়া নিয়েই বৃহত্তর সেখদীঘি গ্রাম। রমনা-সেখদীঘি গ্রামের ঘাটের বাঁদিকে দীঘির পাড়ের উপর সেখ সাহেবের দরগা এবং পাশে একটা মসজিদ ছিল। এখনো তার ভগ্নপ্রায় অস্তিত্ব ল(্য করা যায়। সম্ভবতঃ এই সেখ সাহেবের নাম থেকে দীঘির নাম হয় 'সেখদীঘি'। দরগা ও মসজিদে ওঠার জন্য কালো পাথরের সিঁড়ি ছিল। তার মধ্যে একটি আরবী ভাষায় লেখা শিলালিপি ছিল। ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় 'মুর্শিদাবাদের ইতিহাস'-

এ বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন ‘ ঈ(ের বলিয়াছেন - যে একটি পূণ্য কাজ করে, তিনি তাহাকে দশগুণ পূণ্যফল দান করেন। এই জলাশয় সৈয়দ ‘আশরাফ-উল-হোসেনী’-র পুত্র আলাউদ্দীন দুনিয়াউদ্দিন আবুল মজঃফর হোসেন শাহের রাজত্বকালে খনিত হইল। ঈ(ের তাঁহার রাজ্য ও রাজত্বকে চিরস্থায়ী ক(ন। রবিয়সসানি মাস, ৯২১ হিজরী।’ গৌড়ের বাদশা হুসেন শাহ্ উড়িষ্যা জয় করে রাজধানীতে ফেরার সময় এই দীঘি খনন করান বলে ইতিহাস সা(্য দেয়। বহু অর্থ ব্যয় করে তাঁর তৈরী বাদশাহী সড়কের ধারেই এই দীঘি কাটান হয়। ৯২১ হিজরী অর্থাৎ ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে দীঘিটি খনন করা হয়েছিল। জনশ্রুতি, দীঘি খনন করার পর জল না হওয়ায় সুলতান বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে পড়লে মধ্য এশিয়ার তিরমিজ শহর থেকে আসা ধর্ম প্রচারক ‘ আবু সৈয়দ তিরমিজ’ পীর সাহেব (‘সুলতান পীর’ নামে বিশেষ খ্যাত) দীঘিতে ‘আশা’ (তাঁর হাতের লাঠি) দিয়ে আঘাত করে অলৌকিকভাবে দীঘির নিচে থেকে জল তোলেন। সুলতান হোসেন শাহ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁকে উত্ত(দীঘি এবং অনেক জায়গা জমি দান করেন। উত্ত(পীর সাহেব সেখদীঘিতেই মারা যান এবং এখানে তাঁর মাজার আছে। প্রতি বছর ১লা পৌষ তাঁর মৃত্যুদিনে এখানে উরস পালিত হয়। দীঘির দ(ণ-পূর্ব কোণে চৌরাস্তার সংযোগস্থলে ‘গাজী ইসমাইল রহমতুল্লা আলাই’ নামে, মালদহ থেকে আগত অন্য এক পীরের মাজার আছে। সেখদীঘি বহরমপুর থেকে প্রায় ৪৫ কিমি উত্তর পশ্চিমে ও রঘুনাথগঞ্জ থেকে ১৩ কিমি দ(ণ পশ্চিমে ৩৪ নং জাতীয় সড়কের পাশেই। দীঘির মাঝখানে প্রাচীর ঘেরা একটা জায়গা (হাউজ) আছে, যার দৈর্ঘ্য ৩০০ মিটার ও প্রস্থ ২০০ মিটার।

হা(য়া ঃ বংশবাটীর সামান্য উত্তরে হা(য়া গ্রাম। মধ্যযুগের (ষোলো শতক) বিখ্যাত সাধক ও বৈষ(ব পদকর্তা সৈয়দ মর্তুজা ও তাঁর সাধনসঙ্গিনী আনন্দময়ীর মূল সমাধিটি গঙ্গাগর্ভে বিলুপ্ত হলে ভক্ত(রা সেখানকার মাটি এনে হা(য়াতে একটি নকল সমাধি নির্মাণ করেন। মুর্শিদাবাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাস মর্তুজা-আনন্দময়ীর গু(ত্ব স্বীকৃত।

হিলোড়া ঃ -বংশবাটির ৩ কিলোমিটার পশ্চিমে, বীরভূম সীমান্তে, হিলোড়া অতি প্রাচীন জনপদ। কিছু ইঁটের বাড়ি ও দেবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ গ্রামটির প্রাচীনত্বের নিদর্শন। এখানকার শ্যামসুন্দরদেবের মন্দির প্রসিদ্ধ। কিংবদন্তী, প্রায় ৪০০ বছর আগে বাজিতপুরের মন্দির থেকে শ্যামসুন্দরের কাঠের বিগ্রহ জনৈক বৈষ (ব সাধক হিলোড়ায় এনে প্রতিষ্ঠা করেন। পরে প্রাচীন মন্দির ভেঙ্গে পড়লে, মুরারইনিবাসী হনুমানপ্রসাদ ভকত তিনটি চত্বর ও তিনটি প্রাঙ্গণবিশিষ্ট সুউচ্চ ও বিশাল বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করে দেন। সেটির স্থাপত্য- প্রকরণ অবশ্য অনুল্লেখযোগ্য। রাণী ভবানী ও মুর্শিদাবাদের নবাব পরিবারের আশরফ-উন্নেসা বেগম শ্যামসুন্দরের সেবাপূজার জন্য অনেক নিষ্কর জমি দান করেন। হিলোড়া শক্তি(-উপাসনারও একটি বিশিষ্ট স্থান। সেজন্য এখানকার কালীপূজা বিখ্যাত।